ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ

[১৩৫৮ সনের ফাল্গুন হইতে ১৩৫৯ সনের মাঘ পর্য্যন্ত]

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,

কলিকাতা—৯

প্রতি সংখ্যা—।৵০

সডাক বার্ষিক মূল্য—৪৲

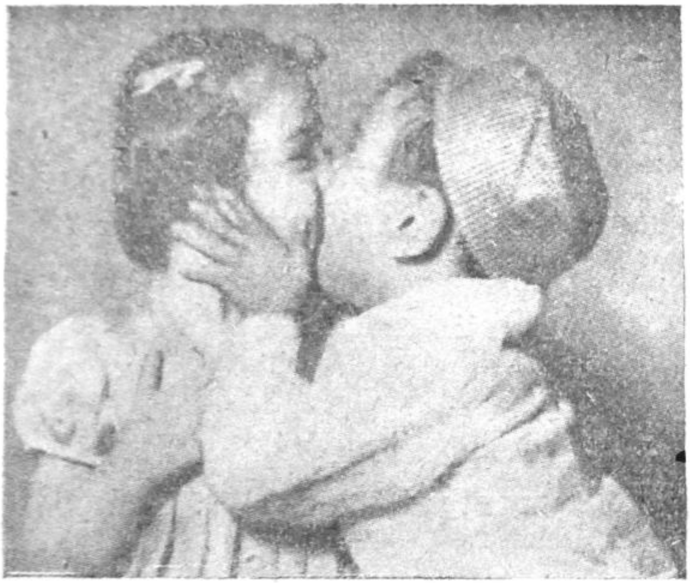

প্রাণে প্রাণে মিলনের উৎস

আগামী বছরের

"শুকতারা"

বার্ষিক সূচী

[* তারকা-চিহ্নিত লেখাগুলি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত]

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
অতীত দিনের স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীশক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়	৬৭৮
অতীতের বাঙালী (ঐতিহাসিক)	শ্রীগণেশচন্দ্র মজুমদার	৬৬১
অনুযোগ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য্য	২৬৭
অন্যায়ের প্রতিরোধ (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, শ্রাবণ
অপমৃত্যু (নক্সা)	দিলীপ চক্রবর্ত্তী	৪৪৬
অবাক্ হয়ে দেখো (বিশ্ব-বৈচিত্র্য)		৬৭, ২৬৯, ৬০৫, ৭০৬
অভাবনীয় (জীবনী-বিষয়ক)	শ্রীগৌরী দেবী	৭৯৫
অমর প্রতিভা (জীবনী)	শ্রীসুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৪২
অমরবাণী	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৮৬
অরবিন্দ স্মরণে	রবীন্দ্রনাথ	মুখপত্র, ভাদ্র
অলিভার টুইষ্ট (বিদেশী গল্প)	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৫৭১
অশ্বরথ ও অশ্ববিদ্যা (প্রবন্ধ)	শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত	৭৫২
আক্কেল (রস-গল্প)	শ্রীসলিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩১০
আগামী বছরের "শুকতারা" (ঘোষণা)…		৭৭৮
আচ্ছা ফ্যাসাদ (কবিতা)	"বহ্নিদূত"	৬৮৮
আচ্ছা ফ্যাসাদ (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	১৯
আটলান্টিকের আতঙ্ক (ঐতিহাসিক)	শ্রীঅমলেন্দু সেন	৩১৩
আমরা (কবিতা)	শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫১
আমাদের কথা (ঘোষণা)		৭১৬
আমাদের গ্রাম (কবিতা)	শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট	৭৮৫
আমার দেশের মানুষ (কবিতা)	শ্রীমানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১
আলো-ছায়ার খেলা (আলোক-চিত্র)		১৪১, ৬৪৫, ৮৩৪
আবার এসেছে শরৎ (কবিতা)	কুমারী আরতি ঘোষ	৬২০
আয় ঘুম আয় ! (পরিচয়)		৫০৬
আয়নার কুহক (ভৌতিক গল্প)	শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৮১
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে (কবিতা)	শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩৬৭
আসেনি সে (রূপক)	শ্রীশঙ্কর ঘোষ	৮৩১
ইতর প্রাণীও কৌতুক জানে (প্রাণি-বিষয়ক)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	৩৪৩
ইতিহাসের ছাত্র (গল্প)	শ্রীহরিপদ মান্না	৭২৫
উজ্জ্বল পাতা (অনুশীলন)		৬৯৫
একটুখানি হাসো (হাস্য-কৌতুক)		৫০, ১৩৯, ২১৪, ২৮০, ৩৫০, ৪২১, ৪৮৪, ৫৫৪, ৬৪৬, ৭৬৯, ৮৩৫
এডিসন (জীবন-কথা)	শ্রীঅমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৮১
ওগো ঝর্ণা (কবিতা)	শ্রীনারায়ণ পাত্র	৪৪৫
ওগো সাদা মেঘের দল (কবিতা)	শ্রীমুরারিমোহন বিট্	৬৩২

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
কলকাতায় নবান্ন (আলেখ্য : উদ্ধৃতি)	...	...	...	৭৭৯
কলাচোর (গল্প)	...	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহু	...	৭৫৫
কে তুমি এলে ? (কবিতা)	...	শ্রী"রত্নদীপ"	...	৬
কে শোনায় বাণী ? (কবিতা)	...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	১৫৯
কৌতুক (কবিতা)	...	শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র	...	৭৫১
খাদ্য বাড়াও (কৃষিবিদ্যা)	...	করবী দেবী	...	১৩৭
খেলাঘর (রহস্য-জগৎ)	...	শ্রীমধুসূদন দেব	...	৬৩৩
খেলার আসর (খেলাধূলা)	...	শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়		৭২, ১৪৭, ২১৫, ২৮১, ৩৫১, ৪২২, ৪৯১, ৫৫৬, ৬৪৯, ৭০৮, ৭৭০, ৮৩৮
খোকার ভয় (কবিতা)	...	শ্রীসবুজ	...	৩৮৯
খোকার মনের কথা (কবিতা)	...	ভারতী	...	৩০৮
খোকার সাধ (কবিতা)	...	কুমারী উমা গুপ্তা	...	৫৪৫
গিরি-গুহার গল্প (প্রত্নতত্ত্ব)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৬২৯
গ্যালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী (বিদেশী গল্প)		শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	২৩৩
গ্রীণল্যাণ্ডের মেরুপথে (আবিষ্কার)	...	শ্রীমধুসূদন দেব	...	৬৭৩
ঘন বরষার গান (কবিতা)	...	শ্রীরঞ্জিতকুমার দাস	...	৩১৭
চকোলেট্ (আবিষ্কার)	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৭৬
চড়ুইভাতির চাঁদা (কবিতা)	...	কুমারী আরতি ঘোষ	...	৮১২
চলার গান (কবিতা)	...	পূরবী মজুমদার	...	২৪৫
চাপা আগুন (স্বাস্থ্য)	...	ডাঃ শ্রীসরসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	...	১১৫
চায়ের মজলিশ্ (বিচিত্র-জগৎ)	...	শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬৯৬
চিত্র-সংবাদ	...	...	...	৭৬৫
চুরির দায়ে চৌকিদার (কবিতা)	...	শ্রীনীলরতন দাশ	...	২৫৮
চৈত্র (কবিতা)	...	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৮৭
চৈত্র ও বৈশাখের প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)		...	...	৭৫
ছুটির দিনে (কবিতা)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৯৯
জব্দ (কবিতা)	...	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	...	৬২৮
জানাই প্রণাম ! (স্মৃতি-কবিতা)	...	শ্রীমতী যমুনা দেবী	...	৭৯৪
জীবনের জয়গান (প্রতিভা)	...	শ্রীদীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৬৬৬
জ্যৈষ্ঠের প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)	...	...	...	১৫২
টমকাকার কুটীর (বিদেশী গল্প)	...	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	৫০৭
টারজানের দ্বিতীয় এ্যাডভেঞ্চার	...	ঐ	...	৫২
ঐ তৃতীয় ঐ	...	ঐ	...	১৬৪
ঐ চতুর্থ ঐ	...	সব্যসাচী	...	৫৩৭
ট্রাপিজের খেলা (গল্প)	...	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৩৫
ডেভিড্ কপারফিল্ড্	...	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	৮৮

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
ঢ্যাম্ কুড়ুকুড় (কবিতা)	শ্রীসুধীরকুমার রায়	৫৩৩
তরুণ হৃদয় (কবিতা)	সৈয়দ হোসেন হালিম	১৩১
তরুণের ডাক (কবিতা)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৬৯
দর্পচূর্ণ (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, বৈশাখ
দি এড্ভেঞ্চার অব এ স্পাই (বিদেশী গল্প)	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৯৭
দুঃখের ইতিহাস (গল্প)	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২৪৭
দুষ্ট বাবার মিথ্যে কথা (কবিতা)	শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী	৬০৪
দুষ্ট ভগবান্ (কবিতা)	শ্রীরমেশ দাস	২৩১
দেশবন্ধু স্মরণে (স্মৃতি)		৬২২
ধান কাটার গান (কবিতা)	শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য্য	৮১৬
ধোঁয়ার বিভীষিকা (স্বাস্থ্য)	ডাঃ শ্রীসরসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৬১৫
নতুন যুগের গণৎকার (বৈজ্ঞানিক)...	শ্রীমধুসূদন দেব	৮২১
নববর্ষে (কবিতা)	শ্রী"কুড়রাম"	১৭৫
নমস্তে (স্মৃতি)		৬৪৮
নীলকণ্ঠ দধীচি (স্মৃতি)	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮৭
নেতাজী (কবিতা) *	ছায়া ভট্টাচার্য্য	৭০
পটল তোলা (কবিতা)	শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য	৭৬৭
পথ চলার গান (কবিতা)	শ্রীসজনীকান্ত দাস	৬১৪
পূজার দিনে (গল্প)	শ্রীনীলরতন দাশ	৫৯৫
প্রণতি জানাই (স্মৃতি)		৪৬৮
প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক)		
প্রতিযোগিতার ফলাফল		১৪২, ১৯৬, ২৭৪, ৩৪৭, ৪১৬
ফাল্গুনে (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৩৩
ফিরে এসো কবি (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫
ফিরে পাওয়া (গল্প)	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট্ সেনগুপ্ত	৫২৯
ফ্রাঙ্কেনষ্টিন (বিদেশী গল্প)	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৬৯
বড়দিন (স্মরণে)		৮১৭
বাইশে জুলাই (স্মৃতি-চিত্র)		৪৭৪
বাইশে শ্রাবণ (ঐ)		৪১৪
বাঘ-বাঘিনীর মুখে (শিকার)	শ্রীপুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৯
বাঙালী এরা নয় (চিত্র-পরিচয়)		মুখপত্র, অগ্রহায়ণ
বাঙালী তুলনাহীন (স্মৃতি-চিত্র)		৪৮৩
বাণী-বন্দনা (গান)	... শ্রীসুধীরকুমার রায়	৮২৬
বাদুড় (প্রাণি-বিষয়ক)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	১২৩
বারুদ-ভরা বই (জীবনীবিষয়ক)	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
বিগ্‌বেন (কবিতা)	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৮

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
বিজয়া (কবিতা)	শ্রীবিদ্যুৎকুমার মল্লিক	৬৬৫
বিজয়িনী (কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৭৩৩
বীর-প্রণাম (কবিতা)	শ্রীমানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩
বুড়িবালামের তীরে (নাটক)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	২৩, ১৩২, ১৭০, ২৫০, ৩৩৩, ৪০৩, ৪৬৯, ৫৪৬, ৫৯৮, ৬৮৯, ৭৩৫, ৮০৫
"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই !" (পৌরাণিকী)	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮৫
ভাই-ফোঁটা (কবিতা)	শ্রী"সী"	৬৫৯
ভাইয়ের ভালবাসা (গল্প) *	শ্রীআশীষ রায়	৪১৭
ভারত-মাতার বাণী (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	মুখপত্র, কার্ত্তিক
ভুলি নাই (কবিতা)	শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৪৬৭
ভুলোর ভয় (কবিতা)	করবী দেবী	২০৫
ভুঁড়ি হল শান্ত (কবিতা)	শ্রীনীলরতন দাশ	৯
ভোঁদার ইঁদুর ধরা (ব্যঙ্গ-চিত্র)	"বোলতা"	৪৯৭
ভোঁদার জ্ঞান-ভাণ্ড (ব্যঙ্গ-চিত্র)	ঐ	২১৯
ভোঁদার বিচিত্র ব্যবস্থা (ব্যঙ্গ-চিত্র)	ঐ	৩৫৭
ভোঁদার ভোজবাজী (ব্যঙ্গ-চিত্র)	ঐ	৬৯
ভোঁদার সার্কাস-পার্টি (ব্যঙ্গ-চিত্র)	ঐ	৬৫৩
ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, ফাল্গুন
মজার খবর শোন	হরকরা	৬৪
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	...	৭৬, ১৫৩, ২২০, ২৮৭, ৩৫৮, ৪৩০, ৪৯৮, ৫৬২, ৬৫৪, ৭১৩, ৭৭৭, ৮৪২
মহেশ (গল্প)	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭
মা (কবিতা)	শ্রীনীরজ বিশ্বাস	৬৬৮
মাতৃদর্শন (কবিতা)	করবী দেবী	৬২
মানুষ ও প্রকৃতি (বৈজ্ঞানিক)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৭১
মায়ের ভালবাসা (গল্প) *	শ্রীজয়ন্ত বসু চৌধুরী	৩৪৮
মাষ্টার মশাই (গল্প)	শ্রীজ্যোতি প্রামাণিক	৪৫১
মাসিক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)	...	২৯৪, ৩৬১, ৪১৬
মোগলকাটার জঙ্গলে (শিকার)	শ্রীপুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৯
ম্যাজিক (যাদুবিদ্যা)	যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার	৬২৩, ৭৪৬
মৃত্যুপণ (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, পৌষ
যাদুকরের ছোঁয়া (স্বাস্থ্যচর্চ্চা)	ডাঃ জহর পাল	৬৯৯
যাদু-জগৎ (চিত্রে সংবাদ)	...	১৯০
যাদুর খেলা (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	৮[illegible]১
যাযাবর (গল্প)*	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল	৮২[illegible]
রবীন্দ্রনাথ (জীবনী) *	শ্রীঅবনীকুমার সিংহ	১৯৭
রাগ ও রাখহরি (কবিতা)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৯৫

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
রাজমুকুটের গতি (চিত্রে ইতিহাস)		২০৯
রান্নাঘর (রন্ধন-শিক্ষা)		৬১, ১৩৮, ২১৩, ২৭৯, ৩৪৬, ৪১৫, ৪৯০, ৫৫৫, ৬৪৭, ৭০৭, ৭৬৮, ৮৩৬
রাশিয়ার একপাতা (ইতিহাস)	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৫
রুখু-চুখু দুটি ভাই (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, আষাঢ়
রেলগাড়ী (কবিতা)	শ্রীনাথ	৪০১
রেলগাড়ী ঝক্‌ঝক্‌ (চিত্রে ইতিহাস)	শ্রীদীপক	৩২৯
লটারীতে লক্ষ টাকা পাইলে কি করিব ? (কল্পনা) *	শ্রীঅখিল সরকার	২৭৫
লিঙ্কনের দাড়ী (জীবনী-বিষয়ক)	শ্রীশুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬৯
লুট (গল্প)	শ্রীমানবেন্দ্র পাল	২০১
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু (গল্প) *	শ্রীসত্যেন্দ্রগোপাল দত্ত	৪৮৫
শরৎ এলো (কবিতা)	শ্রীআনন্দ বাগচী	৫০৫
শিবের বিপদ (গল্প)	শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য্য	৪১১
শীতে (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	৭২৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (জীবনী-বিষয়ক) *	শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য্য	১৪৩
সঙ্গগুণ (কবিতা)	আশা দেবী	৩৮০
সত্যিকারের এড্‌ভেঞ্চার (জীবনী-বিষয়ক) *	শ্রীশঙ্করদাস মুখোপাধ্যায়	৭০৪
সবুজ শার্ট (বিচিত্র)	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৮
সম্পাদকীয়		৮১, ১৫৫, ২২৪, ২৯০, ৩৬২, ৪৩৩, ৫০০, ৫৬৪, ৬৫৫, ৭১৭, ৭৮১, ৮৪৪
সাধকের জয় (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, জ্যৈষ্ঠ
সাধু রুইদাস (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৫২০
সাধুর ক্রোধ (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, মাঘ
সাপে-কুমীরে (চিত্র-পরিচয়)	ঐ	মুখপত্র, চৈত্র
সাবাস বীর (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	৫৮৯
সাহসীর জয় (জীবন-চিত্র)	শ্রীসুলতা কর	৪০৯
সি. আই. ডি. (গল্প)	শ্রীসন্তোষকুমার দাস	৫৪২
সিগারেটের বাক্স দিয়ে (হাতের কাজ)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	৮১০
সিংহবাহিনী (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র, আশ্বিন
সৃষ্টি (পাদপূরণ : কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৪৬৬
সোনার খোকন ঘুমায় (কবিতা)	শ্রীরবিদাস সাহা রায়	৪০৮
স্বাধীন বাংলা অন্ধকার ! (কবিতা)	শ্রীদীপক	৪৮২
হারাধনের দ্বীপ (উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১১, ১০০, ১৮১, ২৬০, ৩১৯, ৩৯১, ৪৫৭, ৫২২, ৬০৬, ৬৭৯, ৭২৯, ৮১৩

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
হাঁদার আক্কেল সেলামী (ব্যঙ্গ-চিত্র)		"বোলতা" …	…	২৮৬
হাঁদার এক্সপেরিমেন্ট ঐ		ঐ	…	৪২৯
হাঁদার ওস্তাদী ঐ	…	ঐ	…	১৪০
হাঁদা-ভোঁদার ক্রিকেট খেলা ঐ		ঐ	…	৭১২
হাঁদা-ভোঁদার সাইকেল চড়া ঐ		ঐ	…	৭৭৬
হাঁদা-ভোঁদার শাস্তি ঐ	…	ঐ	…	৮৪১
হোলির দিনে (কবিতা)	…	শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল	…	১১৪

পাদপূরণ

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
অভিনব প্রায়শ্চিত্ত	…	৫৯৭	থাইল্যাণ্ডে যন্ত্রচাষ (সচিত্র)	…	৩৪
অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি	…	৬১৯	ধানক্ষেতে যন্ত্রে চাষ (সচিত্র)	…	৭১
অবাঞ্ছিত ধনীর দল (উদ্ধৃতি)	…	৬৬৭	ধ্বংস ও সুবিধাবাদী (উদ্ধৃতি)	…	৪৪৪
অতীতের বীর বাঙ্গালী	…	৭৩৪	নারকোল ক্ষেতে যন্ত্রে চাষ (সচিত্র)	…	৬৪
অপরাজেয় বাঙ্গালী	…	৭৪৫	না ছুঁয়ে সম্মোহন (সচিত্র)	…	৫১৯
আকক্ষেতে যন্ত্রের চাষ (সচিত্র)	…	১৩০	বিনা যন্ত্রে ঐকতান (সচিত্র)	…	৫৩৫
আগুন ছাড়া রান্না হয় (সচিত্র)	…	২৯৬	বাংলার তরুণ শক্তি	…	৭২২
আবারও এল সেদিন ? (সচিত্র)	…	৩৩৮	বাঙ্গালীর অসি-ঝঙ্কার	…	৭২৪
উদাত্ত আহ্বান (উদ্ধৃতি)	…	৭১১	ভাবতে কি পারো ? (সচিত্র)	…	১৬৯
এরা সখের চাষী (সচিত্র)	…	১১৪	মাথা চুলকে (১)	…	২৩২
কারাগারে খ্যাতিলাভ	…	২৬৬	ঐ (২)	…	২৫৭
কেন এ দৈন্য আজও ? (উদ্ধৃতি)	…	৩২৮	মায়ের গৌরবে (সচিত্র)	…	২৬৮
কত বড় তবু ! (উদ্ধৃতি)	…	৪০২	মহাত্মা ও মুসলমান (উদ্ধৃতি)	…	৩১৮
কত সিনেমা দেখা যায় ?	…	৬০৩	মরণজয়ী বাঙালী	…	৭৩২
'কমা'য় প্রাণ বাঁচালো	…	৬১৩	যদিও চাষী নয় (সচিত্র)	…	১১৩
খালিপেটে দেশপ্রেম (উদ্ধৃতি)	…	৪৫০	যুগে যুগে চায় (সচিত্র)	…	৩৬৮
খাদ্য ছাড়াই ভোজ (সচিত্র)	…	৫৪১	শরীরটাকে শক্ত কর (সচিত্র) ৮০০, ৮১১, ৮৩০, ৮৪০, ৮৪৩		
গরীয়সী মহিলা (সচিত্র)	…	২৭৮	শ্রেণীহীন সমাজ (উদ্ধৃতি)	…	৬৮৮
ঘুম এসে যায় সম্মোহনে ! (সচিত্র)	…	৫২৮	সোনার ফসল উঠবে ফলে (সচিত্র)	…	১২০
চাষের কাজে যন্ত্র চাই (সচিত্র)	…	৩২	সময়ে কি আসে যায় ? (সচিত্র)	…	১২২
চুরি (সচিত্র)	…	২৮০	সোনার ছবি (সচিত্র	…	১৬৩
চিংড়ির জ্বালা (সচিত্র)	…	৩০৯	সেবাব্রতী চিকিৎসক (সচিত্র)	…	২৫৯
তুলনা	…	১৭৪	সুন্দরে বিষ (সচিত্র)	…	৬১২
তরাসে গলায়	…	৩০৭	সাফল্যের বিচার (উদ্ধৃতি)	…	৬৬৪
তাড়াতাড়ি পড়তে শেখো	…	৪৮৯	"হায় ভগবান্ !" (সচিত্র)	…	৩৭৯

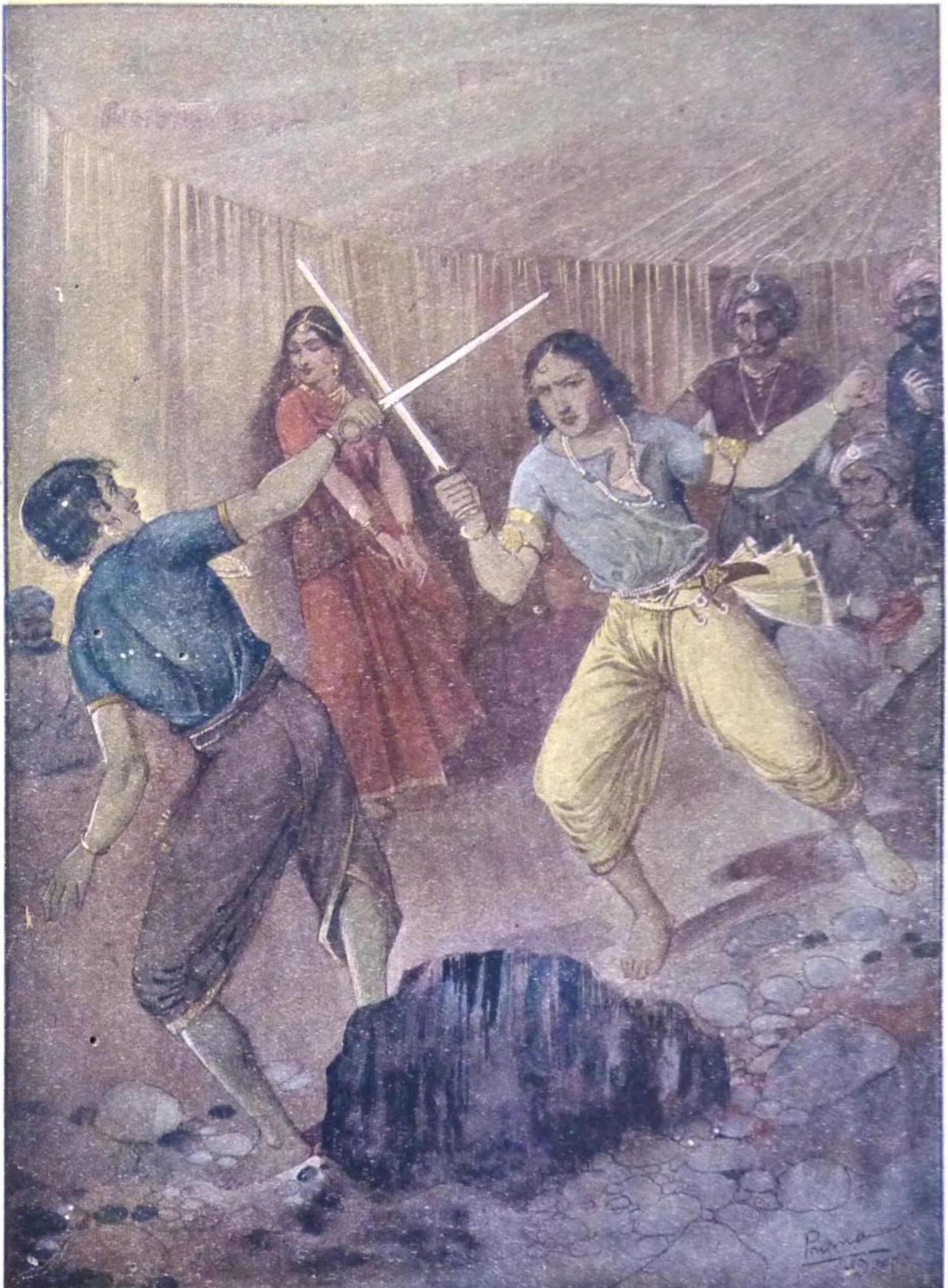

ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব

ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব

—কুমারী তপতীরাণী

ক্ষমতা যাহার সেই বীর পাবে
বসিতে সিংহাসনে,
তাই দুই ভাই শিবিরের মাঝে
মাতিল দ্বন্দ্বরণে।
বাজে অনুখন ঝন্ ঝন্ ঝন্
মুক্ত কৃপাণ দুটি—
একেরে বধিতে অস্ত্রের ঘায়ে
আর ভাই আসে ছুটি।
কেহ নাহি শোনে বারণ কাহারো
মানে না কাহারো মানা—
করিছে প্রয়োগ যুদ্ধে যে সব
কৌশল আছে জানা।
জ্বলে ধক্ ধক্ চক্ষু দু'য়ের
বক্ষে শোণিত-তৃষা,
মরণ-মাতনে মেতে দু'জন
হারায়েছে সব দিশা!
জননী তাদের চক্ষু মুদিয়া
কতই বারণ করে—
বলে, "থাম্ থাম্ বৃথা এই রণ
এক ভাই যদি মরে!"—
কণ্ঠ মায়ের শূন্যে মিলায়
বধির তাহারা তাতে;
অধীর হয়েছে ভ্রাতারে হানিতে
তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে।
যুগে যুগে এই ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব
চলিয়াছে দেশে দেশে,
ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে সব ভাই
ধ্বসিতেছে অবশেষে।

———

শুকতারা

১৩৫৮ } পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা { ফাল্গুন

প্রতাপসিংহ

[প্রত্যেক বছর 'শুকতারা'র প্রচ্ছদপটে ভারত-ইতিহাসের এক একজন মহা-নায়কের ছবি দেওয়া হচ্ছে। এবারকার প্রচ্ছদপটে প্রতাপসিংহের ছবি দেওয়া হয়েছে। প্রতাপসিংহের জীবনকাহিনী তোমরা অনেকেই পড়েছ, এখানে তাঁর জীবনের মূল বিশেষত্বের গল্প তোমাদের আজ বলব ; কারণ, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের কাছে প্রতাপসিংহের জীবনের একটা বিশেষ মূল্য আছে।—সম্পাদক]

(১)

প্রত্যেক জাতের দুটো করে জিনিস থাকে, একটা হলো তার ভূগোল, আর দ্বিতীয়টা হলো তার ইতিহাস। এবং প্রত্যেক জাতের ইতিহাসের সঙ্গে তার ভূগোলের একটা গভীর সম্পর্ক আছে।

যে জাতির দেশ হলো মরুভূমি, তার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, স্বভাব-চরিত্র কখনই সেই জাতির সমান হবে না, যে জাতির দেশ হলো বরফ-ঢাকা, অথবা জঙ্গলে ভরা। তাই প্রত্যেক জাতের বৈশিষ্ট্য খুঁজলে, তার ভূগোলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের ভারতবর্ষের ভূগোলেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

ভারতবর্ষের ভূগোলে একদিকে যেমন হিমালয়, আর একদিকে তেমনি সাগর; ভেতরে একদিকে যেমন শস্যশ্যামলা নরম মাটী, আর একদিকে তেমনি রুক্ষ মরুভূমি আর খাড়া নাঙ্গা পাহাড়। বিচিত্র জিনিসের সমবায়ে গঠিত আমাদের ভূগোল।

আমাদের ইতিহাসেও তাই দেখি, এক-একটা জাত এক-একটা বিশেষ রূপে ফুটে উঠেছে।

বাংলার জল-হাওয়া আর মাটীর সঙ্গে রাজপুতানার জল-হাওয়া আর মাটীর কোন মিল নেই। বাংলায় ফুটে উঠেছে ভারতের শিল্পকলা, সাহিত্য, গান, ছবি, হয়েছে মানব-ধর্ম্মের বিকাশ; রাজপুতানার রুক্ষ মাটীতে তেমনি ফুটে উঠেছে মানুষের কঠিন দিকটা,—বীরত্ব, শৌর্য্য, রাজনীতি, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষ নতুন করে জেগে উঠছে। তার পরম সৌভাগ্য যে, তার চোখের সামনে পড়ে আছে রাজপুতানার বিচিত্র ইতিহাস, যে ইতিহাস থেকে সে অনেক ভাল জিনিসের সন্ধান পেতে পারে, অনেক খারাপ জিনিস সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে, যার দরুণ অসীম বীরত্ব, অসাধারণ শৌর্য্যও কোন কাজে লাগে না।

(২)

দেখা যাক্ প্রতাপসিংহের জীবন আজ আমাদের কাছে কি সংবাদ বহন করে এনেছে!

প্রতাপসিংহের দুর্ভাগ্য যে তাঁর বাবা ছিলেন উদয়সিংহ। রাজপুতানার ইতিহাসে যেমন গৌরবের অপরূপ নিদর্শন আছে, তেমনি আছে দুর্ব্বলতার অতি কুৎসিত প্রকাশ। উদয়সিংহ ছিলেন অত্যন্ত দুর্ব্বল-চিত্ত লোক।

সেকালের রাজাদের প্রথামত তিনিও অনেকগুলো বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর অনেক ছেলে ছিল। ছেলেদের মধ্যে প্রতাপসিংহই ছিলেন বড়। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বীরত্বে প্রতাপসিংহই ছিলেন ছেলেদের মধ্যে সেরা; কিন্তু উদয়সিংহ তাঁকে বিশেষ ভালবাসতেন না।

তাঁর অন্য সব ছেলেদের মধ্যে আর একটী তেজী বীর ছেলে ছিল, তাঁর নাম শক্তসিংহ। শক্তসিংহকেও উদয়সিংহ দেখতে পারতেন না। কারণ, শক্ত যখন

জন্মায়, তখন জ্যোতিষীরা শিশুর ভাগ্য গণনা করে বলে যে, এই শিশু থেকে বংশের চরম ক্ষতি হবে, শিশুর গ্রহ-নক্ষত্রে তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

শক্তও বালক-বয়সে এমন হয়ে উঠলো যে ভয়-ডর কাকে বলে, তার কিছুই জানত না। একদিন রাজদরবারে উদয়সিংহ হীরামুক্তা-বসানো একটা ছোরার ধার আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখছিলেন একরাশ কাপড়ের ওপর। বালক শক্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার কাণ্ড দেখে বালক হেসে উঠলো। বাবার হাত থেকে ছোরাটা টেনে নিয়ে বালক বলে উঠলো, ছোরার ধার কাপড়ের ওপর বুঝি দেখে? ছোরার ধার দেখতে হয়, গায়ের চামড়ার ওপর।

এই বলে বালক তৎক্ষণাৎ সেই ছোরাটা তার নিজের হাতের চামড়ার ওপর বসিয়ে দিলো। ভীরু ভীতু উদয়সিংহ তাই না দেখে মনে মনে শিউরে উঠলেন; জ্যোতিষীদের কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি ভাবলেন, এ ছেলে যখন এখনই এই রকম, তখন বড় হয়ে এ নিশ্চয়ই সিংহাসনের লোভে আমাকেই মেরে ফেলবে। তাই তিনি সব সময় শক্তসিংহকে দূরে দূরে রাখতেন।

তাঁর আর একটী ছেলে ছিল, তার নাম জগমল। সবচেয়ে অপদার্থ, বিলাসী, অলস আর ভীরু। উদয়সিংহ সেই ছেলেটীকেই সব চেয়ে ভালবাসতেন। তাই মরবার সময়, বড় ছেলে প্রতাপসিংহকে সিংহাসন না দিয়ে, তিনি সেই অপদার্থ জগমলকে সিংহাসনে বসিয়ে গেলেন।

জগমলকে সিংহাসনে বসতে দেখে বড় বড় রাজপুত সর্দ্দাররা ভয়ানক রেগে গেল। এই সর্দ্দাররাই ছিল রাজপুত-ইতিহাসের আসল স্রষ্টা। বিপদের সময়, যুদ্ধের সময়, প্রাণ দেবার সময় এঁরাই আসতেন এগিয়ে। রাণার মর্য্যাদাকে, রাণার সম্মানকে এঁরা জীবন দিয়ে রক্ষা করতেন।

এই সময় চন্দাওয়ৎ-কুলের সর্দ্দার ছিলেন বৃদ্ধ রাবৎকৃষ্ণ। রাবৎকৃষ্ণকে প্রত্যেক সর্দ্দারই শ্রদ্ধা করতেন। একদিন রাবৎকৃষ্ণের কাছে সমস্ত সর্দ্দাররা পরামর্শ করবার জন্যে উপস্থিত হলেন। জগমলের মতন একজন অপদার্থ তরুণকে তাঁরা কিছুতেই রাণা বলে স্বীকার করতে পারেন না; বিশেষ করে উদয়সিংহের বড় ছেলে যখন প্রতাপসিংহ, তখন ন্যায়ত ধর্ম্মত প্রতাপসিংহেরই এই সিংহাসনে বসা উচিত।

বৃদ্ধ রাবৎকৃষ্ণ এমন উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে, সর্দ্দারদের সঙ্গে নিয়ে তিনি রাণার দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। জগমল তখন তার পাত্রমিত্রদের নিয়ে সিংহাসনের ওপর বসে ছিলেন।

কৃষ্ণ সর্দার রাবৎকৃষ্ণ সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বজ্রকণ্ঠে সোজা বলে উঠলেন, তুমি ও-সিংহাসনের উপযুক্ত নও, এখুনি নেমে এসো সিংহাসন থেকে। ঐ সিংহাসন হলো মৃত রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহের। অতএব, আমরা প্রতাপসিংহকেই ঐ সিংহাসনে বসাবো।

রাবৎকৃষ্ণের পেছনে সমস্ত সর্দারদের দেখে জগমল ভয়ে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। শুভক্ষণ দেখে সর্দাররা সেই সিংহাসনে প্রতাপসিংহকে বসালেন। এবং আজ ইতিহাস সাক্ষী তাঁরা ভুল করেন নি।

(৩)

এত কাণ্ড করে প্রতাপসিংহ যে সিংহাসনে বসলেন, সে শুধুই সিংহাসন, সে সিংহাসনের পেছনে কোন রাজত্ব ছিল না! তিনি যদিও নামে মেবারের রাণা কিন্তু মেবার তখন মুঘল বাদশাহের করতলে। তিনি মেবার থেকে দূরে পিতা উদয়সিংহের তৈরী প্রাসাদে রাজ্যহীন রাজা হয়ে বসলেন মাত্র। মুঘল বাদশাহ লোভ দেখিয়ে একে একে প্রতাপসিংহের অন্য সব ভাইদের হাত করে নিলেন। এবং সাগরজী নামে প্রতাপসিংহের এক ভাইকে মেবারে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে বাদশাহ আকবর তাঁকেই মেবারের রাণা বলে স্বীকার করলেন।

সমস্ত আত্মীয়-স্বজন একে একে প্রতাপকে ছেড়ে মুঘলের দাসত্ব করতে চলে গেল, একমাত্র প্রতাপসিংহ দূর থেকে সে দৃশ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। প্রত্যেক রাজপুতের হীনতা নিদারুণ লজ্জা হয়ে তাঁর বুকে বাজতে লাগলো।

মানব-ইতিহাসে দুর্লভ হলেও মাঝে মাঝে এমন হয়, যখন বহু যুগের সঞ্চিত ব্যথা, বহু মানুষের সঞ্চিত ক্ষুধা একটী মানুষকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ করে ওঠে। একটা মানুষ হয়ে ওঠে সমগ্র জাতির প্রতীক। সেই একজন মানুষই তাঁর সুকঠোর সাধনায় লক্ষ জনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে যান। মধ্যযুগে ভারত-ইতিহাসের শত দৈন্যের মধ্যে প্রতাপসিংহ হলেন ভারত-চেতনার প্রতীক। তিল তিল করে ভারতবর্ষ যা হারিয়েছিল, এই একটী লোক তাঁর নিজের জীবনের অপরাজেয় গৌরবে তাকে ফিরিয়ে আনেন।

যে-মহিমা মেবার হারিয়ে ফেলেছে, সে-মহিমাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, ফিরিয়ে আনতে যদি না পারি, তা হলে সেই মহিমার মতন করেই জীবন যাপন

করে যেতে হবে, এই আদর্শ বুকে নিয়ে প্রতাপসিংহ মেবার থেকে দূরে উদয়-প্রাসাদের সিংহাসনে বসেই তাঁর মনে হলো, এ সিংহাসন তো খেলাঘরের সিংহাসন, এ প্রাসাদ তো অলস বিলাসিতার প্রাসাদ ! তিনি দুর্জয় পণ করলেন, যতদিন না চিতোর উদ্ধার করতে পারছেন, ততদিন তিনি কঠোর দুঃখ-ব্রত গ্রহণ করবেন, জীবনে কোন সুখ-সাধ কোন বিলাসিতার চিন্তা পর্য্যন্ত করবেন না।

একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে, সেই মধ্যযুগে, সম্পূর্ণ এক একটা মানুষ, আদর্শের পবিত্রতার জন্যে কি দুর্জয় কঠোর সাধনা করে গিয়েছিলেন! সিংহাসনে তিনি বসতেন না, সাধারণ লোকের মতন মাটীর ওপর বসতেন, স্বর্ণ-রৌপ্য-পাত্র ছুঁতেন না, তার বদলে অরণ্যবাসী দরিদ্রদের মতন গাছের পাতা ব্যবহার করতেন ; ব্রত গ্রহণ করলেন, যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন কেশ-প্রসাধন করবেন না, কোমল শয্যায় শয়ন করবেন না।

শুধু যে নিজে এই সুকঠোর আদর্শবাদ গ্রহণ করলেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে যে সব অনুচর রইলো, তাদেরও মধ্যে এই দুর্জয় আদর্শবাদ ঢোকালেন। তিনি তাঁর অনুচরদের আদেশ করেছিলেন, যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন কেউ যেন তৃষ্ণায় মরে গেলেও মেবারের মাটীতে দাঁড়িয়ে এক ফোঁটা জল না গ্রহণ করে, অন্ধকার যত গাঢ় হোক্, কেউ যেন সন্ধ্যায় ঘরে আলো না জ্বালে। প্রতিটী মুহূর্ত্ত জানিয়ে দিক, চিতোর আজও অসমাপ্ত।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ এই দুর্জয় আদর্শবাদকে জীবনের প্রত্যেক কাজে পালন করে গিয়েছেন। তাই প্রতাপসিংহ মানে দুর্জয় আদর্শবাদ, অপরাজেয় প্রাণশক্তি, যে শক্তি জগতের কোন বিরোধিতার কাছে মাথা নোয়ায় না।

স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের জীবনে আজ প্রয়োজন এই দুর্জয় আদর্শবাদের। যে দুঃখ-ব্রত আমরা দেখেছি প্রতাপসিংহের জীবনে, ভারতের ঘরে ঘরে পূর্ণতার আনন্দ আনবার জন্যে, আজকে আমাদের স্বেচ্ছায় বরণ করতে হবে সেই দুঃখ-ব্রত। সেইখানে প্রতাপসিংহের আদর্শকে সত্য করে তুলতে হবে আমাদের জীবনে।

কে তুমি এলে ?

- শ্রী"রত্নদীপ"

(১)

রাত্রে ঘুমিয়ে ছিলাম।
কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো,
আমার নাম ধরে ডাকলো।
শুনলাম, স্পষ্ট কে যেন বলছে,
"আমি এসেছি !"
বিছানা থেকে উঠে বসলাম,
খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম,
সামনেই তাল গাছের মাথার ওপর
শুকতারার নীলা যেন গলে পড়ছে !
বুঝলাম, রাত ভোর হয়ে আসছে।
আবার এলো সেই ডাক,
"আমি এসেছি,
তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি !"

(২)

সারা বর্ষের প্রতীক্ষার শেষে,
নতুন ঊষার উদয়ের আগে
কে তুমি এলে ?
সারা অন্তর ভরে যাকে ডেকেছি
সে কি তুমি ?

যে এলে সব উঠবে ভ'রে,
যা কিছু আছে বাকি, যা কিছু রয়েছে ফাঁকি
যে এসে দেবে সম্পূর্ণ ক'রে—
সে কি তুমি ?

(৩)

তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে বাইরে ছুটে আসি,
দেখি, শেষরাত্রের ম্লান আলোয়
দাঁড়িয়ে রয়েছে অজানা অতিথি···
সারা মুখ, সারা দেহ তার
অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি,
"কে তুমি ?　কে তুমি ?"
নিরুত্তর থাকে সে দাঁড়িয়ে।
"সাড়া দাও, কথা বলো,
খুলে ফেল তোমার অবগুণ্ঠন,
যদি এসেছ,
তবে কেন সারা দেহে তোমার অবগুণ্ঠন ?"

ঝড়ের আওয়াজের মত এলো উত্তর,
"তুমি যাকে ডেকেছিলে, যাকে চেয়েছিলে
আমি সে-ই !"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চীৎকার ক'রে উঠি,
"ওগো আমার সর্ব্ব-কামনার ধন,
ওগো পরম-বাঞ্ছিত,
যদি এসেছ, তবে আর কেন এই আবরণ ?
মোচন কর তোমার আবরণ,
সর্ব্ব দেহ দিয়ে তোমাকে দেখে ধন্য হই !"

সহসা আকাশে নিভে গেল
শেষ তারার প্রদীপ।
আকাশ-পৃথিবী অন্ধকারে হয়ে গেল একাকার,
সামনে চেয়ে দেখি,
অনন্ত-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
শুভ্র আলোক-বিন্দুর মত,
বাঞ্ছিত অতিথি পরম।

দুই চোখে তার জ্বলছে দুই মশাল,
সমস্ত মুখ শুধু একটা বিরাট গহ্বর,
সে-গহ্বরের ভেতর থেকে
আগুনের শিখার মত,
লক্ লক্ করছে হাজার জিহ্বা।
বুকের পাঁজরের শুকনো হাড়ের ভেতর দিয়ে
দেখা যাচ্ছে, বইছে রক্তের স্রোত,···
সে-রক্ত-স্রোতের ভেতর দিয়ে দেখি,
রক্ত-রাঙা উঠছে গোল এক চাকা···
সূর্য্য ?···না, নতুন আর এক গ্রহ ?···

স্তব্ধ বিস্ময়ে বলে উঠি,
"নমো নমো হে মহা-অনিবার্য্য !"

ভুঁড়ি হলো শান্ত

—শ্রীনীলরতন দাশ

জম্বুর জমিদার জগদীশ দত্ত
সারাদিন নাওয়া-খাওয়া চিন্তায় মত্ত।
বিরাট বপুটি তার সুবিশাল ভুঁড়িটি,
আশেপাশে দশ গাঁয়ে নাই তার জুড়িটি।
হাঁড়ি হাঁড়ি কফি খেয়ে চাঙ্গা করে মনটা,
ভৃত্যেরা গায়ে তেল ডলে তিন ঘণ্টা।
তেল মেখে স্নানে যায় খিড়কীর পুকুরে,
নেয়ে এসে খেতে বসে বেলা ঠিক দুপুরে।

ঘুম থেকে জমিদার জাগে এক রাত্রে,
চীৎকার করে বলে—"ব্যথা সারা গাত্রে।
কন্‌কনে যন্ত্রণা পেটে আর বক্ষে,
জ্বলে গেল ভুঁড়ি মোর, নাহি আর রক্ষে।"
যাতনায় জমিদার মরে বুঝি অদ্য,
কেহ ডাকে ডাক্তার, কেহ আনে বৈদ্য।
ডাক্তার দেখে কয়—"নাড়ী বড় মন্দ,
নির্ঘাত নিমোনিয়া, নাই তাতে সন্দ!"
"খাঁটি আমবাত," বলে কবিরাজ পষ্ট,—
"কিছুকাল রোগী পাবে বেদনায় কষ্ট।"
পরদিন প্রাতে আসে আম্‌লারা দেখিতে,
জমিদার যাতনায় লাগে শুধু ধুঁকিতে।
আম্‌লারা কেহ হাত দেয় তাঁর ভুঁড়িতে,
হস্ত বুলায় কেহ বুকে আর দাড়িতে।

একজন হাত যেই দেয় নাভি-বিবরে,—
মনে হয় কুণ্ডলী মত কিবা ভিতরে !
নখ দিয়ে সেটা যেই টেনে বার করলো,—
ঝুপ করে বড় এক জোঁক সেথা পড়লো !

জমিদার যাতনায় ধুঁকিতেছে

সেরে গেল যন্ত্রণা, ভুঁড়ি হলো শান্ত,—
পুকুরেতে স্নান করা সেই থেকে ক্ষান্ত !

হারাধনের দ্বীপ

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

["শুকতারা"র প্রথম দুই সংখ্যায় থাকবে, কেবল এই বিচিত্র জীবন-নাট্যের পাত্র-পাত্রীর ও ঘটনাস্থলের পরিচয়। তারপরেই আরম্ভ হবে রোমাঞ্চকর ও রহস্যময় ঘটনার পর ঘটনা। পাশ্চাত্ত্য আখ্যান অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক)

শ্রীচন্দ্রকান্ত চৌধুরী। আগে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জজ-সাহেব, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন।

একখানি উচ্চ-শ্রেণীর কামরায় চেপে ট্রেনে ক'রে তিনি যাচ্ছিলেন পোর্ট ক্যানিংএর দিকে। সিগার টানতে টানতে পড়ছিলেন একখানি খবরের কাগজ।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে কামরার জানলা দিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সূর্য্যকরদীপ্ত নির্মেঘ আকাশ, তার তলায় মাঠের পর মাঠ, বনের পর বন, তালীকুঞ্জ, বাঁশঝাড়, ঝোপ্-ঝাপ্, ঝিল্-খাল-পুকুর। তারপর তিনি হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। গন্তব্য-স্থলে গিয়ে পৌছতে এখনো বিলম্ব আছে।

খবরের কাগজে অদ্ভুত এই "হারাধনের দ্বীপ" সম্বন্ধে যে-সব কথা বেরিয়েছে, তিনি মনে মনে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। "হারাধনের দ্বীপ!" এমন দ্বীপের নাম কেউ কখনো শোনেনি। অথচ এই অশ্রুত দ্বীপের কথা নিয়ে আজকাল কাগজওয়ালারা ক্রমাগত মাথা না ঘামিয়ে পারছে না।

সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোট-বড়-মাঝারি দ্বীপ আছে অনেক-

গুলি। কোনো কোনো বড় দ্বীপের নাম আছে, আবার অনেক দ্বীপই হচ্ছে একেবারেই অনামা। গত মহাযুদ্ধের সময় কে-এক সাধারণ ব্যক্তি ধনকুবের রূপে অসাধারণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হয়ে সে আবুহোসেনের মত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সুরু ক'রে দেয়। সেই সময়ে কি-এক আজব খেয়ালের দ্বারা চালিত হয়ে সে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোট একটি নামহীন দ্বীপ ক্রয় ক'রে ফেলে, তারপর নিজের মর্জ্জি অনুসারে সেই দ্বীপের নাম দেয়—"হারাধনের দ্বীপ"। এবং অজস্র টাকা ঢেলে সেই বিজন দ্বীপের উপরে প্রাসাদের মতন মস্ত একখানা বাড়ী তৈরি করায়।

হাতে টাকা থাকলে মানুষ খেয়ালের বশে সব-কিছুই করতে পারে। দিবাস্বপ্নে অনেক কিছুই চমৎকার ব'লে মনে হয়, কিন্তু কঠিন বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ালে সুখের স্বপ্ন ছুটে যেতে বিলম্ব হয় না। এই আধুনিক আবুহোসেনও সেই সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলে। দ্বীপে যাতায়াত করবার জন্য নিয়মিত কোন জলযানের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই কলকাতা থেকে আবশ্যক জিনিষপত্তর—বিশেষ ক'রে আহার্য্য-সামগ্রী—যথাসময়ে সরবরাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। তার উপরে বর্ষাকালে সামুদ্রিক ঝড় যখন দুর্ব্বার বেগে দ্বীপকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে এবং দিনরাত ধ'রে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় দ্বীপ হয়ে পড়ে জলে জলে জলময়, তখন দ্বীপের নবাগত বাসিন্দাদের জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্ব্বহ। সুতরাং সেই হঠাৎ-নবাবের খেয়াল ছুটে যেতে বেশী দেরী লাগল না।

মাস-কয়েক যেতে না যেতেই সে আবার কলকাতায় পালিয়ে এসে, বাড়ী-সমেত সেই দ্বীপটাকে জলের দরে বেচে ফেলবার জন্যে খবরের কাগজে উজ্জ্বল ভাষায় বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন দিতে লাগল। কিছুদিন পরেই শোনা গেল, আবার কে-এক নির্ব্বোধ ব্যক্তি পরে পস্তাবে ব'লে সস্তায় সেই দ্বীপটা কিনে নিয়েছে।

চন্দ্রবাবু নিজের পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন একখানা চিঠি। পত্রলেখকের হাতের লেখা যার-পর-নাই খারাপ, কিন্তু জায়গায় জায়গায় তা আবার এমন স্পষ্ট যে পড়তে কোনোই কষ্ট হয় না :—

"প্রিয় চন্দ্রবাবু···অনেক কাল আপনার কোন খবর পাইনি।···কিন্তু আপনাকে এই "হারাধনের দ্বীপে" আসতেই হবে···পরীস্থানের মত সুন্দর দ্বীপ·· কত কথাই বলবার আছে ·· সেই পুরাণো-দিনের কথা···প্রকৃতির কোলে ব'সে উপভোগ করব সূর্য্যের সোনার কিরণ ···আসতেই হবে, নিশ্চয়ই আসবেন।···আসচে বারোই তারিখে পোর্ট ক্যানিংয়ে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আর প্রস্তুত থাকবে আমাদের একখানা 'লাঞ্চ্'।"

তলায় নাম সই করা হয়েছে—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

চন্দ্রবাবু ভাবতে লাগলেন। আট-দশ বছর আগে দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে এক চারুশীলা দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত ধনী জমিদারের বিধবা সহধর্ম্মিণী। তখন তাঁর বয়স ছিল বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ। তিনিও ছিলেন অতিশয় খামখেয়ালী।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন ভূতপূর্ব্ব জজ চন্দ্রকান্ত চৌধুরী।

(খ)

শ্রীমতী স্বপ্না সেন। সেই ট্রেনেই একখানি তৃতীয়-শ্রেণীর কামরায় চ'ড়ে যাত্রা করছে 'পোর্ট ক্যানিং'-এর দিকেই। কামরায় আরো কয়েক জন যাত্রী রয়েছে। সকলেই পরিচিত। স্বপ্না মনে মনে ভাবছিল, ভাগ্যে সে কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তাই এতদিন পরে অস্থায়ী হ'লেও একটা ভালো কাজ পাওয়া গেল। তাকে হ'তে হ'বে একজন মহিলার সঙ্গিনী।

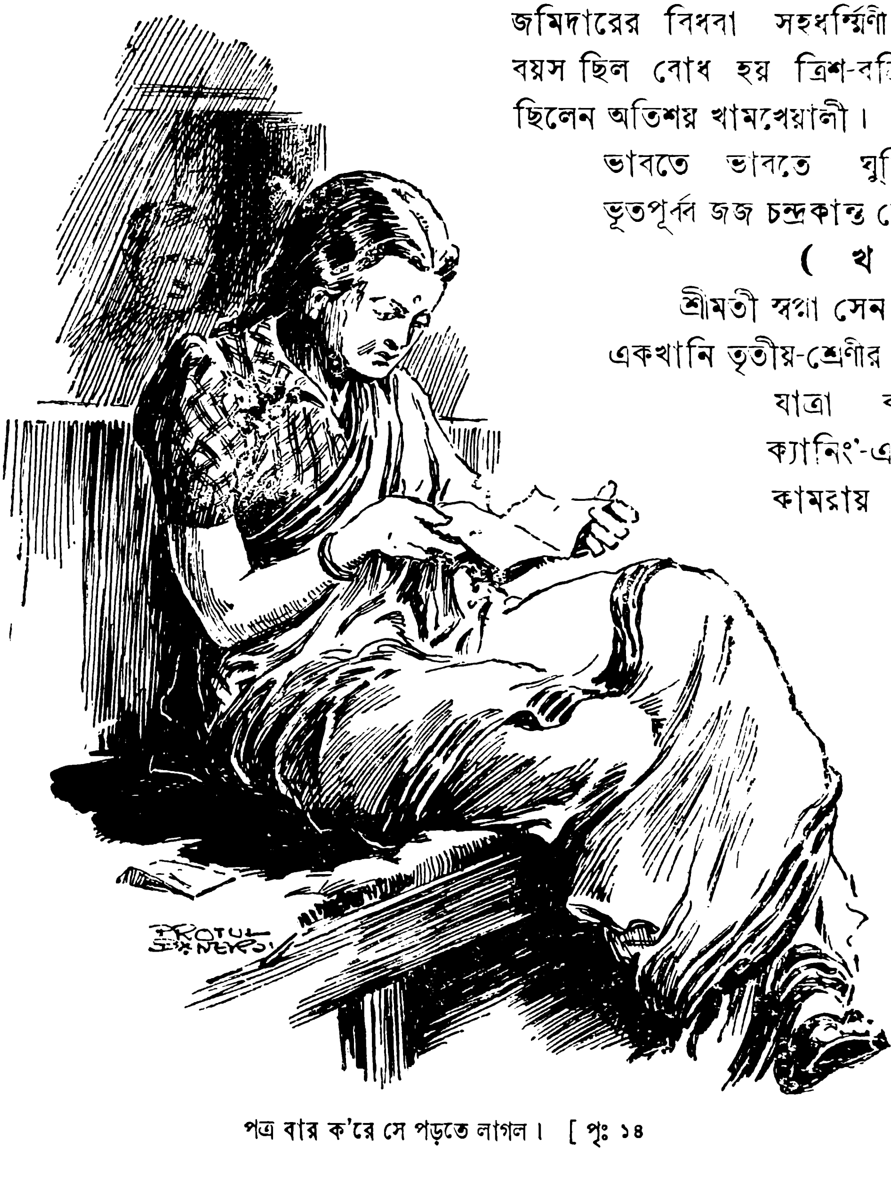

পত্র বার ক'রে সে পড়তে লাগল। [পৃঃ ১৪

পকেট থেকে একখানি পত্র বার ক'রে সে পড়তে লাগল ঃ—

"সংবাদপত্রে আপনার বিজ্ঞাপন দেখেছি। আপনি যে মাহিনা চেয়েছেন তা দিতে আমার আপত্তি নেই। বারোই তারিখে বৈকাল বেলায় আমি 'পোর্ট ক্যানিং'-এ হাজির থাকব। সেই সময়েই আমার সঙ্গে দেখা করলে আনন্দিত হ'ব। রাহা-খরচের জন্যে ২০৲ টাকা পাঠালুম। ইতি—

শ্রীমতী কাননকুন্তলা দেবী।"

কাননকুন্তলা! বাবা, কি কষ্টকল্পিত নাম? ভদ্র মহিলা নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক, নইলে একটা দ্বীপকে-দ্বীপই কিনে ফেলতে পারেন? দ্বীপের নামটাও কি বেয়াড়া! 'হারাধনের দ্বীপ'! কে কবে শুনেছে এমন নাম?

স্বপ্নার মন হঠাৎ ফিরে গেল পিছনের দিকে! মনে পড়ল তার কুমার নরেন্দ্রনারায়ণের কথা। তাঁর কাছে সে কাজ করেছে প্রায় দুই বৎসর। কাজ কিছু কঠিন নয়, বিপত্নীক নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র শিশুপুত্রকে দেখাশুনা করবার ভার ছিল তারই উপরে। নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র বংশধর নীরেন্দ্রনারায়ণ। সেই হ'ত তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

স্বপ্না শিউরে উঠল। নরেন্দ্রনারায়ণ—নরেন্দ্রনারায়ণ—না, না, নরেন্দ্রনারায়ণের কথা মন থেকে তার একেবারেই মুছে ফেলা উচিত!

কিন্তু—কিন্তু আর একটা করুণ দৃশ্য যে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না! পুরীর সেই সমুদ্রতীর! নীরেন্দ্রনারায়ণের ছোট্ট মুখখানি একবার ভাসছে, একবার ডুবছে—ভেসে যাচ্ছে উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে। সেও তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলে বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চিত ভাবেই জানতো সে, কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না তাকে।

না, না, কেন সে আবার ভেবে মরছে এইসব দুঃস্বপ্নের কথা?

নিজের মনকে শক্ত ক'রে স্বপ্না কামরার জানলার দিকে ফিরে বসল। চেয়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির নাচঘরে চলচ্চিত্রের পর চলচ্চিত্র—এক ছবি সুমুখে আসে, আর এক ছবি মিলিয়ে যায়!

(গ)

স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠিক তার সামনের বেঞ্চিতেই বসেছিল অমলেন্দু সেন।

নিজের মনে মনেই সে বললে, "মেয়েটি সুন্দরী বটে। বেশ বুদ্ধিমতী ব'লেও মনে হয়। আচ্ছা, পরে এর সঙ্গে একটু ভালো ক'রে আলাপ করতে হবে।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মন আবার ব'লে উঠল, "ধ্যেৎ, এ-সব আলাপ-পরিচয়ের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই। এখন কাজের সময়, সে এসেছে জরুরি কাজের ভার নিয়ে।

হুঁ। এ্যাটর্ণি বিজন বোস। লোকটা হচ্ছে অত্যন্ত রহস্যময়। বলে কিনা, 'বেশী কথার দরকার নেই অমলেন্দুবাবু। আপনার মত কি বলুন? হাঁ, কি, না?'

অমলেন্দু বলে, 'আপনি পাঁচ হাজার দিতে চান?' এমন অবহেলাভরে কথাগুলো সে বলেছিল, যেন পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। অথচ সে-সময়ে পরের দিনের খাবার কেনবার সামর্থ্যও তার ছিল না। সে-সময়ে এটুকুও সে বুঝতে পেরেছিল যে, বিজন বোস তার অবহেলার ভাবটা মোটেই আমলে আনেনি। এ্যাটর্ণিদের চোখে ধূলো দেওয়া সহজ নয়। বিজন বোস চুপ ক'রে আছে দেখে সে আবার সুধোয়, 'তাহ'লে এ-বিষয়ে আপনি আর কোনো খবর দিতে রাজি নন্?' বিজন বোস নিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'না অমলেন্দুবাবু! আমার মক্কেল ভালো ক'রেই খবর নিয়ে জেনেছেন যে, আপনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হ'লেও আপনার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা এখন সচ্ছল নয়। তাঁরই কথামত আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব এই সর্ত্তে যে, আসছে ১২ই তারিখে বৈকাল বেলায় আপনি "পোর্ট ক্যানিং"-এ গিয়ে হাজির থাকবেন। সেখান থেকে একখানা মোটর লাঞ্চ্ আপনাকে নিয়ে হারাধনের দ্বীপে যাত্রা করবে। তারপর দ্বীপে উপস্থিত হয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে আমার মক্কেলের ইচ্ছা অনুসারে।'

অমলেন্দু বলে, 'সেই দ্বীপে আমাকে থাকতে হবে কতদিন?'

—'এক সপ্তাহের বেশী নয়।'

অমলেন্দু অল্পক্ষণ চিন্তা ক'রে বলে, 'কিন্তু জেনে রাখবেন, আমি কোনো বে-আইনী কাজ করতে প্রস্তুত নই।'

মুখ টিপে মৃদু হাসি হেসে বিজন বোস বলে, 'কেউ আপনাকে বে-আইনী কাজ করতে বললে দ্বীপ থেকে অনায়াসেই আপনি চ'লে আসতে পারবেন, কেউ বাধা দেবে না।'

নিকুচি করেছে! এতক্ষণ পরে লোকটা আবার মুখ টিপে হাসলে। আইন-বিরুদ্ধ কাজ করা অমলেন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ নয়, ও-হাসি যেন ইঙ্গিতে সেই কথাই প্রকাশ করতে চায়! হ্যাঁ, দু-একবার নিজেকে সামলাবার জন্যে তাকে এমন-কিছু করতে হয়েছে, তা মুখ ফুটে বলা যায় না দশ জনের সামনে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে সে সামলে নিতে পেরেছে, কোনো বাধা না মেনেই।······হ্যাঁ, কোনো বাধা না মেনেই!

তা হারাধনের দ্বীপটা তার কাছে বোধহয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না। একসঙ্গে ভ্রমণ ও অর্থোপার্জ্জন !"

(ঘ)

গাড়ীর একটা কোণ নিয়ে সিধে হয়ে চুপ ক'রে বসেছিলেন সৌদামিনী দেবী। বয়স তাঁর পঁয়ষট্টীর কম হবে না। একহারা দেহ, ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। মাঝে মাঝে বিরক্ত চোখে কামরার অন্যান্য লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কামরার ভিতরে ভীড় আর গ্রীষ্মের আতিশয্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। একটু অসুবিধা কেউ সইতে পারে না, সব তাতেই বাড়াবাড়ি ! এই তো আমি কেমন স্থির ও শান্তভাবে ব'সে আছি ! আমাকে দেখেও কি ওদের বুদ্ধি হয় না ?

কামরার ভিতরে ছিল জন-চারেক তরুণী। তাদের হাবভাব ও সাজপোষাক একেবারে বেহদ্দ বেহায়ার মত। আমাদেরও বয়সকালে মেয়েরা সাজপোষাক ভালোবাসত। কিন্তু তখন তো এমন নির্লজ্জতা কখনো দেখিনি ! কালে-কালে হ'ল কি ? এদের কঠিন শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সৌদামিনী তাকালেন জানলার বাইরের দিকে। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে না, মনে মনে ভাবছিলেন তিনি গত বৎসরের কথা।

হ্যাঁ, গত বৎসরে এই সময়ে তিনি ছিলেন গিরিডিতে। এবারে চলেছেন গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে, হারাধনের দ্বীপে।

'ভ্যানিটি কেস্' থেকে একখানা আগে-পড়া চিঠি বার ক'রে আবার পড়তে লাগলেন ঃ—

"প্রিয় সৌদামিনী দেবী, আশা করি আমাকে আপনি ভুলে যাননি। কয়েক বৎসর আগে আমরা দু'জনে পশ্চিমে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়েছিলুম, এ-কথা আপনার মনে আছে তো ? সেদিনের মিলন-স্মৃতি আজও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আছে।

গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে আমি একটি ছোট দ্বীপ কিনেছি। সেখানে মনের মত একখানি বাড়ীও পেয়েছি। তার ভিতরে গিয়ে বসলে আপনি ভুলে যাবেন সব একেলে ঝঞ্ঝাটের কথা—অর্থাৎ এরোপ্লেন, ট্রাম-বাস-মোটর, গ্রামোফোন, রেডিও-সিনেমা আর মেয়েদের আধ-হাত-উঁচু হাই-হিল্ জুতোর কথা। আপনি যদি মাস-খানেক এখানে এসে যাপন করেন, তাহ'লে অত্যন্ত আনন্দিত হ'ব। জায়গাটির একটি নামও দিয়েছি—'হারাধনের দ্বীপ'। নামটা সেকেলে, নয় ? তা আমরা দুজনেই তো সেকেলে যা-কিছু পছন্দ করি ! আসবেন। আসছে ১২ই তারিখে বৈকাল বেলায় 'পোর্ট ক্যানিং'-এ আমি আপনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকব। ইতি—

আপনার কাঃ কুঃ"

আবার কাঃ কুঃ ? মানুষটি কে ? সাটে নাম লিখেছে কেন ? ফি বছরেই তো একবার ক'রে এখানে-ওখানে বেড়াতে যাবার অভ্যাস তাঁর আছে। কবে, কোথায় এই মানুষটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে না তো ! তিনি মেয়ে না পুরুষ ? লেখার ছাঁদ দেখে তো মনে হয় মেয়েমানুষ। তা যিনিই হোন্, বিনা পয়সায় এমন বেড়িয়ে আসবার লোভ তো ছাড়া যায় না ! শেষ পর্য্যন্ত দেখাই যাক্ না কেন ?

(ঙ)

ট্রেন একটা স্টেশন এসে থামল। বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকালেন মেজর সেন। একে তো এই-সব পাড়াগেঁয়ে ট্রেনগুলো গরুর গাড়ীর সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করে, তার উপরে ঘড়িঘড়ি যখন-তখন যে-কোনো স্টেশনে এসে অচল হয়ে থাকা। জ্বালাতন !

কিন্তু এই 'কাঃ কুঃ' লোকটা কে ? লিখেছে ঃ "আমাদের এই হারাধনের দ্বীপে এলে আপনার দুইজন পুরাতন বন্ধুর দেখা পাবেন। আমিও আপনার কাছে নতুন মানুষ নই। সবাই মিলে কিছুদিন আবার পুরাতন স্মৃতির জগতে বাস করা যাবে।"

পুরাতন স্মৃতির জগতে ? সেখানে বাস করবার জন্যে তাঁর মনে কোনোই আগ্রহ নেই। সেখানে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভালো লাগে না তাঁর। অতীত কালের কথা ভাবলেই মনে জাগে তাঁর বিশেষ এক ঘটনার স্মৃতি। সে ঘটনা তিনি লুকিয়ে রাখতে চান সন্তর্পণে।

কিন্তু চুলোয় যাক্ সে-সব কথা। এই হারাধনের দ্বীপের রহস্যটা কি ? আজ-কাল খবরের কাগজে প্রায়ই এই অজানা দ্বীপটার সম্বন্ধে অদ্ভুত-সব কাহিনী পাঠ করা যায়। হঠাৎ সেখানে তাঁর আমন্ত্রণ হ'ল কেন ?

ভেবে-চিন্তে কোনোই সুরাহা হ'ল না। ট্রেন আবার চলতে সুরু করলে। তিনি আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

(চ)

ডাক্তার বোস গম্ভীরভাবে তাঁর রিজার্ভ-করা কামরার ভিতরে ব'সে আছেন।

আজ জীবনের পথ হয়েছে তাঁর কুসুমাস্তৃত ! অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক কাঁটা-ঝোপ পার হয়ে আজ তিনি যে-পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা নিয়ে যাবে তাঁকে উচ্চতম সৌভাগ্যের দিকে। আজ তাঁর হাতযশের কথা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে। তাঁকে ঘিরে থাকে রোগীদের জনতা, না-চাইতে তাঁর ঘরে এসে পড়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা। কয়েক বৎসর আগেও এটা ছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার। তাঁর বর্ত্তমান উপভোগ্য, তাঁর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

কেবল অতীতে থেকে গিয়েছে একটি খুঁত। তখনো তিনি আরোহণ করেছেন খ্যাতির সোপানে. কিন্তু একটি মাত্র ঘটনা তাঁর জীবনকে ক'রে তুলেছিল অপ্রীতিকর। কেবল অপ্রীতিকরই নয়, আর একটু হ'লেই ভেঙে পড়তে পারত তাঁর যশের ভিত্তি। থাক্ সে-কথা নতুন ক'রে আর ভাববার দরকার নেই। কিন্তু এই লোকটা কে? এমন ক'রে নিজের নাম সই করেছে, ভালো ক'রে পড়াই যায় না। কিন্তু, সে যে তাঁকে চেনে, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। হারাধনের দ্বীপে গিয়ে কিছুদিন অবকাশ যাপন করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি।

অবকাশ! যেন অবকাশের সুযোগ তাঁর আছে! রোগী আর রোগী, টাকা আর টাকা! রোগী দেখা বন্ধ করলে টাকা আসাও বন্ধ হয়। কিন্তু রোগী আর টাকা নিয়েই তো প্রতিদিন কাটিয়ে দেওয়া চলে না। মাঝে মাঝে হাপ্ ছাড়তে না পারলে জীবন যে হয়ে উঠবে বিষাক্ত! হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই তাঁর জীবন হয়ে উঠেছে ভারবহ। কিছু-দিনের ছুটি না নিলে এ ভার আর নামবে না। তাই তিনি গ্রহণ করেছেন এই আমন্ত্রণ।

(ছ)

ট্রেনের আর একটি কামরায় ব'সে মহেন্দ্র নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর মনে মনেই বললে, "পোর্ট ক্যানিং-এ পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই।" বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে বার করলে একখানা পকেট-বুক। তারই খানকয় পাতা উল্টে এক জায়গায় থেমে সে কতকগুলো নামের ফর্দ্দ পাঠ করতে লাগল: চন্দ্রকান্ত চৌধুরী, স্বপ্না সেন, অমলেন্দু সেন, সৌদামিনী, মেজর সেন, ডাক্তার বোস, মনোতোষ চৌধুরী এবং নিত্যানন্দ দাস ও সত্যবালা—স্বামী আর স্ত্রী। বাড়ীখানা তদারক করবার ভার আছে শেষ দুজনেরই উপরে।

মহেন্দ্র নিজের মনেই বললে, "তাহ'লে এই ক'জনকে নিয়েই আমার কারবার। তা এদের নিয়ে বেশী বেগ পেতে হবে না ব'লেই মনে হচ্ছে।"

পকেট-বুকখানা আবার বুক-পকেটের ভিতরে স্থাপন ক'রে জানলা দিয়ে সে একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলে। পাশের কামরার আর এক ভদ্রলোকও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই মহেন্দ্র জানলার কাছ থেকে স'রে এসে বসল। আপন মনে বললে, "গোঁফ্ দেখেই চিনেছি! সেই মিলি-টারি ভদ্রলোক! উনি আমাকে চিনতে পারলেন কিনা জানি না। কিন্তু যদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি বলব? বললেই হবে, আমি সিংহল-প্রবাসী বাঙালী, স্বদেশে বেড়াবার সখ হয়েছে, তাই এদিকে এসেছি।" [ক্রমশঃ]

———

যাত্রা-ফ্যাসাদ

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

সাত্ দিন হোলো ছুটি বাপীদের আপিসে,
তাইতো আমোদে মাতে আমাদের বাপী যে।
বাক্স গুছিয়ে নিল, বেঁধে দিল বিছানা,
ছুটির এ-ক'টা দিন কাটাবে সে মিছা না।
সাধ তার হোলো বড় বিদেশেতে বেড়াতে,—
খাওয়া-দাওয়া সেরে তাই ট্রেণে চড়ে সে রাতে ;
সাধের কুকুর ভোলা, সাথে নিল তাকেও,
কুকুর বড়ই খুশী, 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ও।

সারারাত ট্রেণ চলে 'হুস্ হাস্' আওয়াজে,
গায়ে লাগে কন্‌কনে পশ্চিমে হাওয়া যে।
ন্যাটা-গোটা কুকুরটা শুয়ে ল্যাজ্ গুটিয়ে,
ট্রেণ থামে, বাপী তারে দিল ঠেলে উঠিয়ে।
সারারাত কেটে গেছে এই রেল-গাড়ীতে—
এবার নাম্‌তে হবে,—হোটেলের বাড়ীতে—
যেতে হবে এখুনি যে তাই বাপী লাহিড়ী—
তাড়াতাড়ি ট্রেণ হতে ছুটে হোলো বাহির-ই।

অনেক হয়েছে বেলা—চেয়ে দেখে ঘড়িতে,
বাক্স বিছানা ছাতা বের করে ত্বরিতে।
ভুলোর আমেজ লাগে, তাইতো সে ছুটিয়া—
ধেই ধেই নাচ জোড়ে বাক্সেতে উঠিয়া।

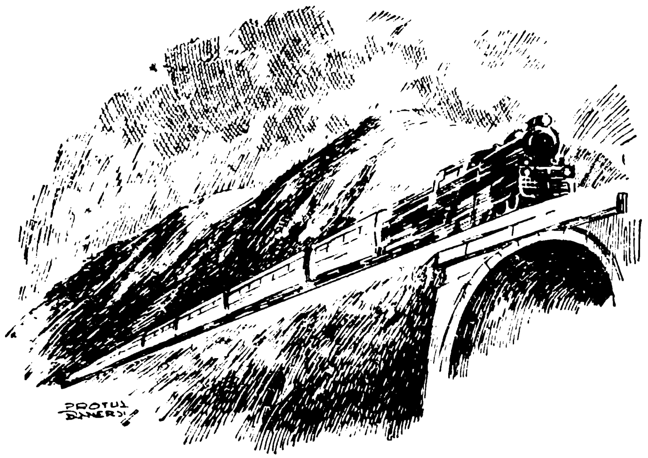

চিঠি পেয়ে বন্ধু সে এসেছিল ষ্টেশনে,
বাপীরে সে নিয়ে যাবে,—কার কথা কে শোনে ?
ভেবেছিল বাপী আজ উঠ্‌বে যে হোটেলে,—
জোর করে নিজ-বাড়ী নিয়ে গেল ও ঠেলে।

সারি সারি কত ঘর, বাড়ী চক্‌-মিলানো,
বড় বড় দালানেতে ভারি ভারি খিলান্‌-ও।
ভোলাটা হারায়ে ফেলে আপনারে পাছে সে,
ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে খালি মনিবের কাছে সে।
একটু সাহস পেয়ে উঁকি-ঝুঁকি লাগালো,
পাশের ঘরের দিকে একটু সে আগালো।
ক্ষুধায় জ্বলে যে নাড়ী,—দেরী হবে খেতে যে,
দেরী হবে মাংসের হাড়্‌-গোড়্‌ পেতে যে।

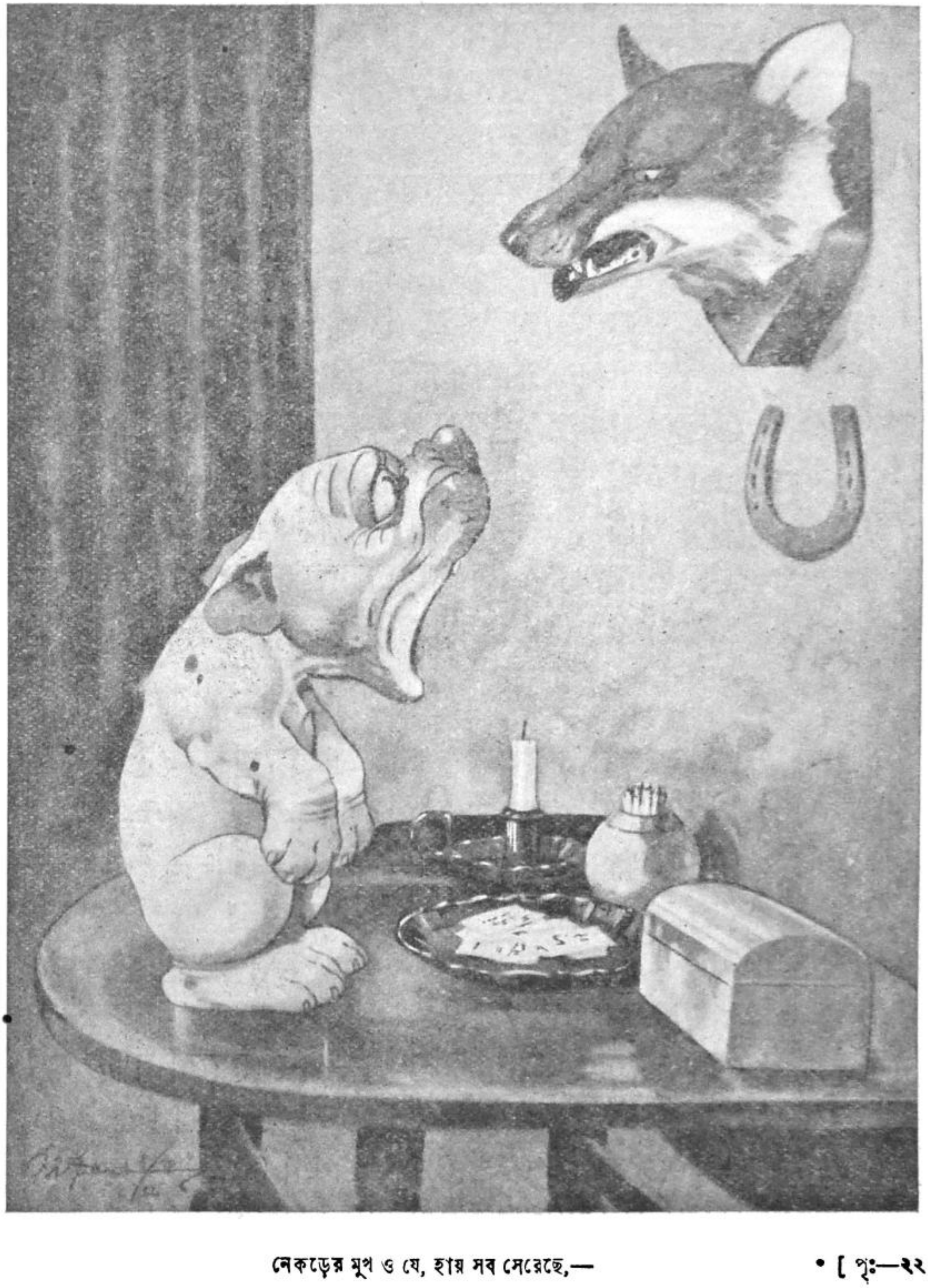

নেকড়ের মুখ ও যে, হায় সব সেরেছে,—

[পৃঃ—২২

এখন একটু আহা কিছু যদি পেটে যায়,
জলযোগে অনায়াসে বেলাটুকু কেটে যায়।
তারপর আছে 'খ্যাঁট্',—লোক গেছে বাজারে,
মাংস পোলাও আর তাজা মাছ-ভাজা রে!
কপাকপ্ খেতে হবে, হাড় খাবে চুটিয়ে,—
কেড়ে নিতে এলে কেউ—দাঁত দেবে ফুটিয়ে।

এই ভেবে ভোলা ঢোকে ও-পাশের ঘরে যে—
পর্দা সরাতে তার নজরেতে পড়ে যে—
টেবিলের উপরেতে শাদা শাদা কি জানো,—
ছানার বরফী বুঝি রসে আছে ভিজানো!
কেউ নাই আশে-পাশে নিরালা এ দুপুরে—
এক লাফে ওঠে ভোলা টেবিলের উপুরে।
পাশে আছে ছোট এক মোমবাতি নিভানো,
রসের খাবারগুলো বেশ যাবে চিবানো।

হঠাৎ দেয়ালে ওকি! ওরে বাবা গেছি রে!
'গাঁক্ গাঁক্' করে' ভোলা করে চেঁচামেচি রে!
নেকড়ের মুখ ও যে, হায় সব সেরেছে,—
দফা বুঝি রফা আজ, এইবারে মেরেছে!
'ধক্ ধক্' জ্বলে চোখ,—দাঁতগুলো ধারালো,
সাক্ষাৎ যম যেন কাছে এসে দাঁড়ালো!
কোথা গেল খাওয়া-দাওয়া,—সব হোলো মাটি রে,—
পাক্ড়িয়ে গেলে বুঝি নেকড়ের 'হাঁ'টিরে!
থর্ থর্ কাঁপে দেহ, চোখ হোলো ঘোলা যে,—
আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে আমাদের ভোলা যে!

———

বুড়িবালামের তীরে

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চরিত্র

মিঃ কেনেডী—জনৈক ইংরেজ ব্যারিষ্টার।
যতীন—বিপ্লবী বীর। (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন)
সামসুল আলম—সি. আই. ডি. অফিসার।
রামভুজ } —মিঃ কেনেডীর দরওয়ান ইত্যাদি।
ইলাহি }

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

মজঃফরপুর। ব্যারিষ্টার কেনেডী সাহেবের গৃহ।

রাত্রি দশটা। নেপথ্যে বহুকণ্ঠের কোলাহল। ব্যস্তভাবে কেনেডী সাহেব শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন।

কেনেডী। Why, what's up? রামভুজ! ইলাহি বক্‌স! কেয়া হুয়া?

(দ্রুত ভৃত্যগণের প্রবেশ ও ক্রন্দন)

রামভুজ। হজৌর! (ক্রন্দন)

ইলাহি। ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা! (ক্রন্দন)

কেনেডী। I say, what are you crying for, fools?—আরে, এক আদমী ত ঠাণ্ডা হইয়ে বাৎ কহনা চাহি! দুই পহর রাতমে তোম লোগ্‌কা রোনেকা জরুরৎ কেয়া ভৈল, ইয়ে ত বাতাও!

রামভুজ। হামি বোল্‌তে সকোগে নেই। শ্রীভগমান জান্‌তা—হামি সাথ্‌ রহনে সে কোই দুশমন মিসিবাবাকো—

ইলাহি। ঔর মায় গাড়ীমে রহতে ত—আল্লা কসম—মেমসাব—

কেনেডী। Shut up, both of you! কেয়া হইয়েসে মিসিবাবা ঔর মেমসাব্‌কে? গাড়ীমে কুছ্‌ accident? ক্লারা, আনা—উহারা বাঁচিয়ে আছে ত? My God! হামি—আরে, কোই ত এক আদমী বাতাও বা কি ক্যা ভৈল? হুজুর সাবকা কোঠীমে ত উন্‌ লোগ্‌ গ্যয়া থা—

ইলাহি। জী হুজুর, হুঁই ত গ্যয়া থা! লেকিন তামাম মুলুকমে ডাকু লোগোকা য়্যায়সাই জুলুমবাজি হুয়া—আজকল—আল্লা কসম—পাত্তা লাগনে সে ম্যয় কলিজা ফাড়্‌ লেঙ্গে সব কোইকো!

রাম। আরে—তুম ঠহরো ত! কেয়া বোলে!—মেমসাব ত মেমসাব নেহি থা, উন থা মেরি মাতারি। হাম ক্যা করে? কাঁহা যায়? আরে তুম্‌ বদমাশ বোম্বাজ—তোম্‌কো টুট্টিকা লহু হাম পী লেঙ্গে!

কেনেডী। Idiots! তুমলোক চাবুক খানে মাংতা, do you? কেয়া ভৈল মেমসাবকা ঔর মিসিবাবাকো—ইয়ে তুন্‌ লোগ বোলনে সক্‌তা নেই, উল্লু?

(সামসুল আলমের প্রবেশ)

সামসুল। ব'লছি আমি—মিষ্টার কেনেডী!

কেনেডী। But you seem to be a police officer!

সামসুল। To be sure!—এই চাকরদের চ'লে যেতে বলুন—

কেনেডী। এইও—হঠো তুম্‌ লোগ—দুনো গিদ্ধড়!

(রামভুজ ও এলাহি সভয়ে প্রস্থান করিল)

কেনেডী। Now, do tell me—

সামসুল। একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘ'টেছে। Fatal—

কেনেডী। Fatal? Oh, my Christ! Which of the two? ক্লারা? আনা? My wife? My daughter?—Which of them?

সামসুল। I am sorry, দু'জনেই—মিষ্টার কেনেডী!

কেনেডী। দু'জনেই? Good God! (টলিতে টলিতে একটা টেবিল ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন)

সামসুল। কিন্তু ওরা ধরা প'ড়বে। আততায়ীকে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে দেখলে অবশ্যই এ শোকে কিছুটা সান্ত্বনা আপনি পাবেন। Now, Goodnight, আমি ওদের ধ'রবার জন্যই বেরিয়েছি!

(প্রস্থানোদ্যত)

কেনেডী। আততায়ী? কে সে?

God knows—হামার কোন শট্রু নাই। জীবনে কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই —হামার স্ত্রী-কন্যাকে কে হত্যা করিল? Mr. officer, one moment please, কে সে আততায়ী—জানিতে পারিয়াছেন কি?

সামসুল। জানতে পারি নি, তবে অনুমান করেছি। নাম-ধাম যা-ই হ'ক, সেটা খুব দরকারী নয়। সবচেয়ে যা দরকারী কথা, সেটা আন্দাজ ক'রতে পেরেছি। মিষ্টার কেনেডী, আপনার স্ত্রী-কন্যা কোন ব্যক্তিগত আক্রোশে আপনার কোন শত্রুর দ্বারা নিহত হন নি। আমি যদি খুব ভুল না ক'রে থাকি—গুপ্তঘাতকেরা হ'ল রাষ্ট্রের শত্রু, এ্যানার্কিষ্ট! Excuse me, দেরী ক'রতে পারছি না। God give you peace—Goodnight—

(দ্রুত প্রস্থান)

কেনেডী। রামভুজ! You idiot! ইলাহি! You three-fold fool!

(যতীন্দ্রনাথের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। ওদের কাছে ত কোন খবর পাবেন না, মিষ্টার কেনেডী! আমি সব ব'লছি আপনাকে।

কেনেডী। ষ্টেনো? টুমি? এটো রাট্রে টুমি?

যতীন্দ্র। কাল দ্বারভাঙ্গা রাজ-এষ্টেটের সেই বড় মামলাটা রয়েছে—তারই ফাইল তৈরী ক'রে রাখছিলাম আপনার আফিস ঘরে ব'সে। এমন সময়ে ঐ উড়ো খবরটা আসে। সাইকেল নিয়ে আমি তক্ষুণি বেরিয়ে যাই জজ সাহেবের বাংলোর দিকে।

কেনেডী। Is it true, then? Clara and Anna, both?

যতীন্দ্র। Both, unhappily, Mr. Kennedy!

কেনেডী। But why? And how? ঐ পুলিশ অফিসার বলিল—হত্যাকারীরা সম্ভবতঃ এ্যানার্কিষ্ট! What's your idea?

যতীন্দ্র। পুলিশ-অফিসার?

কেনেডী। What's your idea? —But tell me first, ঘটনাটি ঠিক কী ভাবে ঘটিয়াছে? কী অস্ত্রে উহারা মরিল? My God! To think that they were going to a tea-party at the judge's!

যতীন্দ্র। অস্ত্রটা দেখেই হয়ত পুলিশ মনে ক'রেছে যে আততায়ীরা এ্যানার্কিষ্ট। কিন্তু সাহেব, আপনি ত জানেন সাধারণ দস্যুরাও বিলেতে বোমা পিস্তল ব্যবহার ক'রে থাকে।

কেনেডী। কিন্তু this is not বিলাত!

যতীন্দ্র। এ দেশের লোক সব কিছু ব্যাপারেই যখন আপনাদের অনুকরণ

ক'রছে, তখন অস্ত্রের ব্যাপারেই বা পিছনে প'ড়ে থাকবে কেন ?

কেনেডী। But the weapon ? কী অস্ত্র ব্যবহার হইয়াছে ?

যতীন্দ্র। বোমা।

কেনেডী। Bomb ? a thousand devils ! ইহারা anarchist না হইয়া যায় না। তুমি লোগ কী বলে উহাকে ? স্বদেশী ডাকাত। But I am losing time ! আমি এখনই জজ-সাহেবের বাংলোতে যাইতেছি। Did you see the-er-the bodies ?

যতীন্দ্র। না। মেমসাহেবদের আগেই হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। আপনিও সেখানেই যান। জজসাহেবের কুঠিতে গিয়ে ত ফল নেই !

কেনেডী। Righto ! will you come with me ?

যতীন্দ্র। আপনি যেতে বলেন ত যাব। কিন্তু শোক পবিত্র। আপনার শোকের সময় এই কালা বাঙ্গালীর উপস্থিতি আপনার ভাল লাগবে কি ? তার চেয়ে মামলার ফাইলটা—

কেনেডী। Right you are, steno যদিও তুমি কালা বাঙ্গালী বলিয়া—somehow তোমাকে দেখিয়া কোনদিন আমি নিজের চেয়ে ছোট বিবেচনা করিতে পারি নাই। Well, I am off to have a last look at them—God give me courage !

(প্রস্থান)

যতীন্দ্র। রামভুজ !

(রামভুজের প্রবেশ)

এদিককার ঘরগুলো বন্ধ ক'রে দাও। আমি আফিস ঘরে গিয়ে ব'সছি রামভুজ ! এখনো ঘণ্টাখানেকের কাজ আছে আমার।

(প্রস্থানোদ্যত)

রামভুজ। বাবু সাব !

যতীন্দ্র। কী রামভুজ ?

রামভুজ। হম লোগ শুন্‌তা কি বম্ ফেকা হ্যায় স্বদেশী লোগ্ ?

যতীন্দ্র। স্বদেশী লোগ্ দু'টো স্ত্রীলোকের উপর বোমা ফেলবে কেন রামভুজ ?

(সামসুল আলমের প্রবেশ)

সাম। ও প্রশ্নের উত্তর রামভুজ নিশ্চয়ই দিতে পারবে না যতীন বাবু !

যতীন্দ্র। আপনি কে ?

সাম। C. I. D. officer সামসুল আলম--at your service. ব'লছিলাম কি, ও প্রশ্নের উত্তর বোকা রামভুজের কাছে না চেয়ে—এইও ! ভাগো !

(রামভুজ সত্বর প্রস্থান করিল)

যতীন্দ্র। C. I. D. officer—তা —মিস্টার কেনেডী ত এইমাত্র হস্‌পিট্যালে গেলেন। আপনি হয় সেখানে যেতে

পারেন, নয় ত আফিস ঘরে এসে অপেক্ষা করতে পারেন তাঁর জন্য !

সাম। ধন্যবাদ ! কেনেডী সাহেবের কাছে আমার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নেই। আমি এসেছি আপনারই সঙ্গে একটু আলাপ ক'রতে।

যতীন্দ্র। আমার সঙ্গে ? খুলে বলুন Mr. C. I. D. officer !

সাম। দুর্গাদাস নামে একটা ছোকরা ধর্ম্মশালায় এসে বাস ক'রছিল এই কয়েক দিন। তার সঙ্গীও ছিল একটা, নামটা তার এখনো জানা যায় নি !

যতীন্দ্র। দুর্গাদাস ? আঃ, ঘুম পাচ্ছে !

সাম। ঘুমোবেন ! ঘুমোবেন ! জেল-হাজতে কম্বল বিছানা পেতে রেখেছি মোলায়েম ক'রে !—আমার দু'একটা কথা যা জিজ্ঞাসা ক'রবার আছে, তার উত্তর এখন না দিতে চান, সেই শয্যায় শুয়ে আরাম ক'রতে ক'রতেও দিতে পা'রবেন।

যতীন্দ্র। You want to arrest me, then ! কী কারণ, জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি, Mr. C. I. D. officer ?

সাম। Nothing for nothing ! আপনি যদি দুর্গাদাস সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি না করেন, আমিই বা গ্রেফ্‌তারের কারণ কী জন্য আপনাকে ব'লতে যাব ?

যতীন্দ্র। দুর্গাদাস সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল মেটাবার মাল-মশলা যদি আমার পকেটে না থাকে, বানিয়ে গল্প ব'লতে বলেন না কি ?

সাম। বানিয়ে ব'ললেও চ'লবে ! তবে, আমি যে outline দেব, গল্পটা তার উপরে দাঁড় করালেই ভাল হয়। শুনুন outline—ধর্ম্মশালায় দুর্গাদাসের কাছে একটি লোককে দুই-তিন বার আসতে দেখা গিয়েছিল—তাকে অনেকে চেনে এ শহরে।

যতীন্দ্র। আমি কিন্তু চিনি না। দুর্গাদাসকেও চিনি না, শহরের অনেক-লোকের-চেনা দু'-তিন-বার দুর্গাদাসের সঙ্গে মোলাকাতকারী সেই নামহীন অভাগ্যকেও চিনি না। আপনি কি ওয়ারেণ্ট এনেছেন আমার নামে ? যদি এনে থাকেন, দেখান !

সাম। ওয়ারেণ্ট ? What for ?—আপনার মত ষ্টেনোগ্রাফারকে গ্রেফ্‌তার করতে সামসুল আলমের ওয়ারেণ্ট লাগে না।

যতীন্দ্র। ওয়ারেণ্টবিহীন C. I. D. officerকে কাণ ম'লে ঘর থেকে বা'র ক'রতে যতীন মুখুজ্যেরও এক সেকেণ্ডের জন্য মনে দ্বিধা জাগে না !

সাম। গোস্তা কি ! (পকেটে হাত দিলেন)

(যতীন্দ্র লাফাইয়া পড়িয়া সামসুলের হাত

চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহার পকেট হইতে রিভলবার তুলিয়া লইলেন)

যতীন। এই বিষদাঁত ভেঙ্গে দিলাম তোমার। এখন যত খুসী ফণা তুলে গজ্‌রাও'

সাম। বিদ্রোহী! এ্যানার্কিষ্ট! ঠিকই ধরেছি আমি। দুর্গাদাস আর তার বন্ধুই জজ সাহেবের বাংলোর আশে পাশে ঘুরছিল কিছুদিন থেকে। তারা এবং তুমি—তোমরাই বোমা ফেলে দু'টি নারী হত্যা করেছ আজ। ওদের পিছনেও লোক ছুটেছে, তোমাকেও এখনই গ্রেফ্‌তার ক'রব। ওয়ারেণ্ট? ওয়ারেণ্ট আমি আধ ঘন্টার ভিতরই আনতে পারি। কিন্তু কেন আনব? জন কতক কনষ্টেবল ডেকে—(বাঁশীতে ফুঁ দিতে গেলেন)।

যতীন। (বাঁশী কাড়িয়া লইয়া) ও সব চিন্তা ছেড়ে দাও। Mr. C. I. D. officer! আমাকে গ্রেফ্‌তার ক'রতে হ'লে ওয়ারেণ্ট আনতে হবে। বেরিয়ে পড়, সে উদ্দেশ্যে। যত শীগ্‌গির যাবে, ততই ভাল।

সাম। অর্থাৎ আমি বেরুলেই তুমি পালাবে।

যতীন। তুমি না বেরুলেও আমি পালাব। এই পিস্তল আমার হাতে দেখছ, তুমি যদি আমার আগে না বেরিয়ে পিছনে আসতে চাও, ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব জন্মের মতন।

সাম। এই যে, এই যে, মিষ্টার কেনেডী!

(কেনেডীর প্রবেশ)

কেনেডী। আমি পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছি, C. I. D. officer!

সাম। এখন এই দুর্বৃত্তকে—

কেনেডী। আমার ষ্টেনো যে দুর্বৃত্ত, তাহা আগে প্রমাণ কর, অফিসার!

সাম। আপনার স্ত্রী-কন্যার হত্যাকারী যারা, তাদের সঙ্গে এর সংযোগ ছিল।

কেনেডী। প্রমাণ? প্রমাণ? আমি মোকার্জিকে কয়েক মাস যাবৎ দেখিতেছি। সে ভদ্রলোক, ইহা আমি শপথ লইয়া বলিতে প্রস্তুত আছি। পক্ষান্তরে, তুমি উহার সম্বন্ধে কিছুই জান না, অফিসার! কে এক দুর্গাদাসকে তুমি হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিতেছ। তাহাকে এখনো পাকড়াইতে পার নাই। সেই অদৃশ্য দুর্গাদাসের সঙ্গে মোকার্জির দুই একবার দেখা হইয়াছিল—এই কারণে যদি মোকার্জিকে হাজতে পূরিতে হয়, তাহা হইলে ত ধর্মশালার ভৃত্য পাচক, রাজপথের টাঙ্গাওয়ালা একাওয়ালা, পানবিড়ি সরবতওয়ালা—এ সহরের অর্দ্ধেক লোককেই সঙ্গে সঙ্গে ধরা দরকার! কারণ, দুর্গাদাস ধর্মশালায় বাস করিয়াছিল, রাস্তায় বাহির হইয়া টাঙ্গা-একাতেও

চড়িয়াছিল, এবং কখনো ফিরিওয়ালার নিকট হইতে পান বা বিড়ি কিনিয়াও খাইয়াছিল। Not so fast, my dear officer! ইংরাজ রাজত্বে আইন বলিয়া একটা বস্তু আছে। খুসীমত মানুষকে ধরিয়া বেইজ্জত করিবে তোমরা, এমন ক্ষমতা আইন তোমাদিগকে দেয় নাই।

সাম। আমি পুলিশের লোক, আমি আইন জানি না?

কেনেডী। আমি ব্যারিষ্টার, আমার চেয়েও বেশী আইন তুমি জানো?

সাম। ও যদি পালায়, তবে আপনি দায়ী থাকিবেন।

কেনেডী। কখনো না। আমি কেন দায়ী হইব? তোমার যদি অধিকার থাকে, এবং তুমি যদি মোকার্জিকে ধরিতে পার, লইয়া যাও! তারপর আইন বলিয়া কোন বস্তু যদি দেশে থাকে, আমি তাহারই বলে উহাকে খালাস করিয়া আনিব।

সাম। আপনি পিস্তল ফিরাইয়া দিতে বলুন!

যতীন্দ্র। আর বাঁশীটাও!

কেনেডী। Off with you, shameless braggart! নিজের অস্ত্র অপরে কাড়িয়া লইয়া যায়, তুমি আবার পুলিশের কাজ করিতে আসিয়াছ?

সাম। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এসব কথা ব'লব!

কেনেডী। মোকার্জি! উহার পিস্তল আর বাঁশী দিয়ে দাও। He dares not molest you in my presence!

যতীন। এস হে অফিসার! (পিস্তল ও বাঁশী ফিরাইয়া দিলেন।)

সাম। আবারও দেখা হবে—

(প্রস্থান)

কেনেডী। মোকার্জি!

যতীন। স্যার!

কেনেডী। আমাকে কিছু বলিবার আছে কি তোমার? Mind, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তবে যদি কোন পরামর্শের প্রয়োজন থাকে—তুমি যেরূপ বিশ্বস্তভাবে এতদিন আমার কাজ করিয়াছ—তাহাতে পরামর্শ না দেওয়া আমার উচিত হইবে না।

যতীন্দ্র। পরামর্শ? না! তবে আপনার কাছে বিদায় নিতে চাই, আর যাবার আগে একটা স্বীকারোক্তি ক'রে যেতে চাই। আপনার কাছে যে সহৃদয় ব্যবহার আজ পেয়েছি, তার বিনিময়ে—

কেনেডী। I see!—ঐ দুর্গাদাস—

যতীন্দ্র। ওটা ওর ছদ্মনাম। আসল নাম ওর ক্ষুদিরাম, আর ওর বন্ধুটির নাম প্রফুল্ল। বয়স কুড়ির নীচে দুইজনেরই।

কেনেডী। ওরাই—ওরাই আমার?

যতীন্দ্র। দোহাই সাহেব! বিশ্বাস করুন আমাকে! আপনার স্ত্রী-কন্যাকে ওরা হত্যা ক'রতে চায়নি। জজ কিংস-ফোর্ডের গাড়ীতে ওঁরা যাবেন, এ ত স্বপ্নেও

কেউ ভাবতে পারত না ওদের লক্ষ্য ছিল ঐ কিংসফোর্ড

কেনেডী। কিংসফোর্ড? কেন? কেন? কুড়ি বৎসরের নীচে যাদের বয়স, তারা কিছু দাগী চোর বা খুনে ডাকাইত হইতে পারে না জজসাহেবের উপর এই বালকদের কী আক্রোশ থাকিতে পারে?

যতীন্দ্র। ওদের চাইতেও ছোট একটি বালককে ঐ জজসাহেব চাবুক মেরেছিলেন—এই হ'ল এই দু'টি বালকের আক্রোশের কারণ।

কেনেডী। চাবুক? উহাদের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বালককে? My God!

যতীন্দ্র। একবিন্দু অতিরঞ্জিত নয় সাহেব! কলকেতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তখন ঐ কিংসফোর্ড। আদালত অবমাননার দায়ে আমাদের নেতা বিপিন পালকে উনি কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।

কেনেডী। Yes, I remember the case.

যতীন্দ্র। তারই প্রতিবাদে মিছিল বেরিয়েছিল একটা।

কেনেডী। এই সবই ভুল। উহাতে কী কাজ হয়?

যতীন্দ্র। সাহেব! গণবিক্ষোভে যদি কাজ না হ'ত, তা হ'লে আপনাদের দেশে পার্লামেন্ট সৃষ্টি হ'ত না কোনদিন, তা আমার চাইতে আপনিই ভাল জানেন।

কেনেডী। That's a fact!

যতীন্দ্র। কিন্তু যা ব'লছিলাম! ঐ যে মিছিল, তার উপর গোরা সার্জ্জেন্টরা হাঁকাতে সুরু করে হাণ্টার।

কেনেডী। Oh, the bastards! উহারা আমার স্বদেশীয়, উহা ভাবিলেও আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।

যতীন্দ্র। সেই হাণ্টার পড়ে একটি চৌদ্দ বছরের বালকের গায়, নাম তার সুশীল।

কেনেডী। You don't say so! হায়, এই সবই ত সাম্রাজ্যধ্বংসের পূর্ব্বলক্ষণ! And what happened then?

যতীন্দ্র। যা ঘ'টল, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। যা ইতিপূর্বে আর কোনদিন ঘটেনি, তাই ঘ'টল! চৌদ্দ বছরের বালক ফিরে দাঁড়িয়ে গোরা সার্জ্জেন্টের নাকে মারল ঘুষি!

কেনেডী। Brave! Brave boy! —এবং এই অপরাধে জজ কিংসফোর্ড—

যতীন্দ্র। এই অপরাধেই ঐ কিংসফোর্ড বেত্রদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন সুশীলকে। চৌদ্দ বছরের জন্য চৌদ্দ ঘা চাবুক।

কেনেডী। The brute! The demon! I shall cut him the next I meet him at the club!

যতীন্দ্র। এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন—ঐ ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল কেন—

কেনেডী। You really have a secret society then—

যতীন্দ্র। বিশ্বাস করুন—ও সম্বন্ধে আমি এখনো বিশেষ কিছুই জানি না। এবার ক'লকেতায় গিয়ে—

কেনেডী। কলিকাতায় তুমি যাও! কারণ এখানে থাকিলে পুলিশ তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করিবে। তবে, সেখানে গিয়া—গুপ্ত সমিতিতে—না মোকার্জি! উহার দ্বারা কদাচিৎ ভাল কাজ হয়। সাধারণতঃ ওগুলি এই জাতীয় ছোট ছোট হত্যাকাণ্ড লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। গুপ্তসমিতি হইতে গ্যারিবল্‌ডী বা ক্রমওয়েল জন্মে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

(টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া কি যেন লিখিতে লাগিলেন)

কেনেডী। (যতীনের নিকট আসিয়া) এই নাও তোমার বেতনের টাকা—আর এই নাও একখানা চিঠি। কলিকাতা সেক্রেটারিয়েটে আণ্ডার-সেক্রেটারী হুইলার আছেন। তাঁহাকে এই চিঠি দিও। তিনি আমার বন্ধু, হয় ত তিনি তোমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন।

যতীন্দ্র। কী ভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ?

কেনেডী। ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই। তবে আমাকে যদি খুসী করিতে চাও, তবে হত্যাকাণ্ডের ভিতরে যাহাতে আসিতে হয়, এমন কাজ কখনও করিও না। দেখিলে ত ? কিংসফোর্ডকে মারিতে গিয়া দু'টি নারী-হত্যা ঘটিল। (ভগ্নস্বরে) আমার নিজের সর্বনাশ হইল বলিয়া যে আমি গুপ্তসমিতির কাজের নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, গুপ্তসমিতি হইতে কখনো গ্যারিবল্‌ডী ক্রমওয়েলের মত বীরের উদ্ভব হয় না।

যতীন্দ্র। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী ক্রম-ওয়েলের ধাতুতে যাকে ভগবান গ'ড়েছেন, সে যদি নিজের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য গুপ্তসমিতির সাহায্য নেয়, তাতে ত দোষ নেই ?

কেনেডী। তা হয় ত না থাকিতে পারে। ভাবিয়া দেখি নাই! বলিতে পারি না।—কিন্তু তুমি কি নিজের কথা বলিতেছ ?

যতীন্দ্র। না, না, আমি নিজেকে ক্রমওয়েলের সঙ্গে তুলনা ক'রব—এমন পাগল আমি নই! আমি আপনার আশী টাকার ষ্টেনোগ্রাফার, একথা সবাই জানে, আমিও জানি। আমি বিদায় নিচ্ছি—স্যার! বিদায়-বেলায় আপনার মহত্বের কাছে মাথা নীচু ক'রে যাচ্ছি। আর সবিনয়ে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছি আপনার স্ত্রী-কন্যার শোচনীয় নিয়তির জন্য।

কেনেডী। শোচনীয়, সত্যই শোচনীয়। কখনো ভাবিতে পারি নাই যে এমন ঘটনা ভারতবর্ষে ঘটিতে পারে। কিন্তু

পারা উচিত ছিল, কল্পনাশক্তি এত দুর্বল হওয়া উচিত ছিল না আমার। শুধু আমার কেন? কিংসফোর্ডের উচিত ছিল না, সেই গোরা সার্জ্জেণ্টের উচিত ছিল না। কলিকাতার পুলিশ-কমিশনারের উচিত ছিল না, উচিত ছিল না স্বয়ং বড়লাটের। দম্ভের প্রতিদান আইসে বিদ্বেষের আকারে, শাস্তির প্রতিদান আইসে রক্ত-পাতের ভিতর দিয়া। আজ বোমা পড়িয়াছে আমার স্ত্রী-কন্যার মাথায়, কাল ফাঁসীতে ঝুলিবে ঐ ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল, পরশু বড়লাটকে বোমা মারিবে এই যতীন মোকার্জি! (যতীন্দ্রের দিকে তাকাইয়া) না, না, ভগবান্, তুমি যেন গ্যারিবল্‌ডী ক্রমওয়েলের মত বীরই হইতে পার! তুমি যে ভাবে মনের কথা সরল ভাবে আমাকে খুলিয়া বলিয়াছ, তাহাতে আমার আশা যে অন্ধকারে বোমা না ছুঁড়িয়া দিবালোকে মুখোমুখি শত্রুকে ঘায়েল করিবার দিকেই তোমার লক্ষ্য থাকিবে সমধিক!

যতীন্দ্র। নিশ্চয়! তাতে আনন্দ বেশী, গৌরব বেশী, এবং—এবং তাতে নারীহত্যার আশঙ্কা কম।

[ক্রমশঃ]

চাষের কাজে যন্ত্র চাই

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগেও কোন দেশ বা জাতি যদি পিছিয়ে থাকতে চায়, চাষের কাজে আজও যদি কেউ যন্ত্রের সাহায্য না নয়, তাহলে দুর্ভিক্ষ সেখানে পাকাভাবে বাসা বেঁধে নেয়। ভারতবর্ষে আজও তাই এত অন্নাভাব। কিন্তু চাষীদেরও জানা দরকার যে, এমনি ধারা "জেন্" নামক রোটারী যন্ত্রের সাহায্যে জল-কাদার জমিতেও চাষ করা কত সহজ!

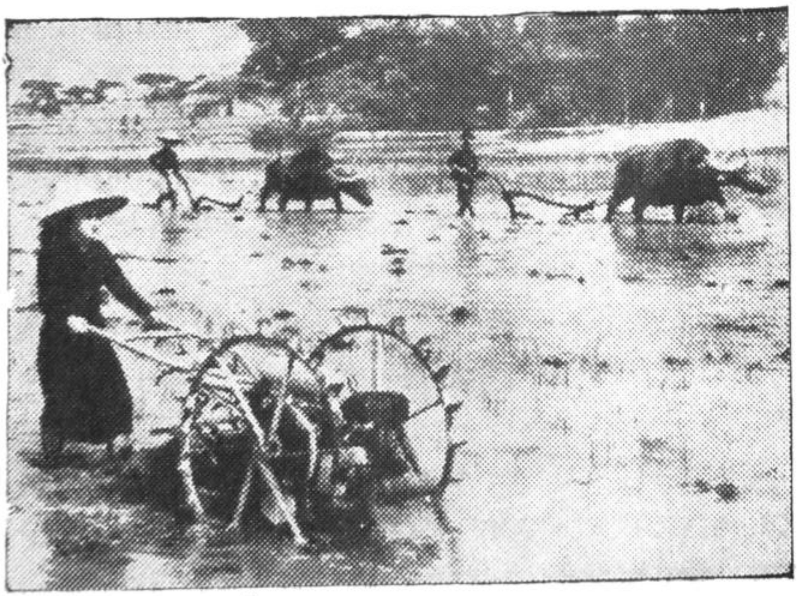

ফাল্‌গুনে

—শ্রীপ্রভাকর মাঝি

ফাল্গুনে আজ ফুলের বনে পড়লো মহোৎসব,
রামধনু-রঙ ফুলপরীরা করছে কলরব।
মৌমাছি কয় কানে কানে,
কে যাবি আয় আম-বাগানে,
দখিন হাওয়ায় আম-বকুলের সুমিষ্ট সৌরভ,
ফাল্গুনে আজ ফুলের বনে লেগেছে উৎসব !

কুক্ কুক্ কুক্ গান গাহে কে বনের নিরালায়,
আকুল-করা আহ্বানে তার চমক লেগে যায়।

শাল-পিয়ালের মঞ্জরীতে
পড়লো সে ডাক আচম্বিতে,
আবেশটুকু ছড়িয়ে গেল
নাগ-কেশরের গায়,
কুক্ কুক্ কুক্ সুর ওঠে ঐ
বনের নিরালায় !

'কদমতলি' গাঁও পেরিয়ে সর্ষে ক্ষেতে ক্ষেতে
হলুদ-বরণ ওড়নাখানি কে দিয়েছে পেতে ?
রাখাল-রাজার বাঁশীর সুরে
স্বপন জাগে তৃণাঙ্কুরে—

জংলা ছেলে মউল ফুলের
মালিকা নেয় গেঁথে,
হলুদরঙা ওড়না ওড়ে
সর্ষে ক্ষেতে ক্ষেতে।

ফাল্গুনে আজ নিখিল জুড়ে
লাগলো খুসির দোল,
শিলাই নদীর কূলে কূলে
জেগেছে কল্লোল!
তোমার মনে, আমার মনে,
জাগলো পুলক প্রতিক্ষণে,
সেই পুলকের পরশ পেয়ে অতীত বেদন ভোল,
ফাল্গুনে আজ সবার মনে লাগলো খুসির দোল!

থাইল্যাণ্ডে যন্ত্রে চাষ

থাইল্যাণ্ডে ছোট-বড় অধিকাংশ জমিতেই আজকাল রোটারী যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করা হয়। আগেকার যুগে চাষ করতে গেলে বড় বড় ষণ্ডা জোয়ান চাষীও ঘামিয়ে যেতো; কিন্তু এখন সেখানে যে কোন তরুণীর উৎসাহই যথেষ্ট! তারই দৌলতে সেখানে ফসল ফলে তারে তারে আর ঘরে ঘরে ফুটে ওঠে নিত্যি-নতুন সোনার ছবি!

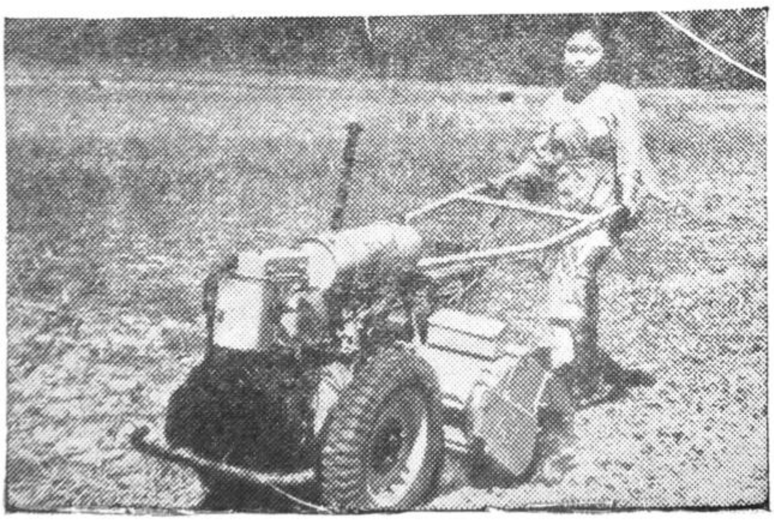

ট্র্যাপিজের খেলা

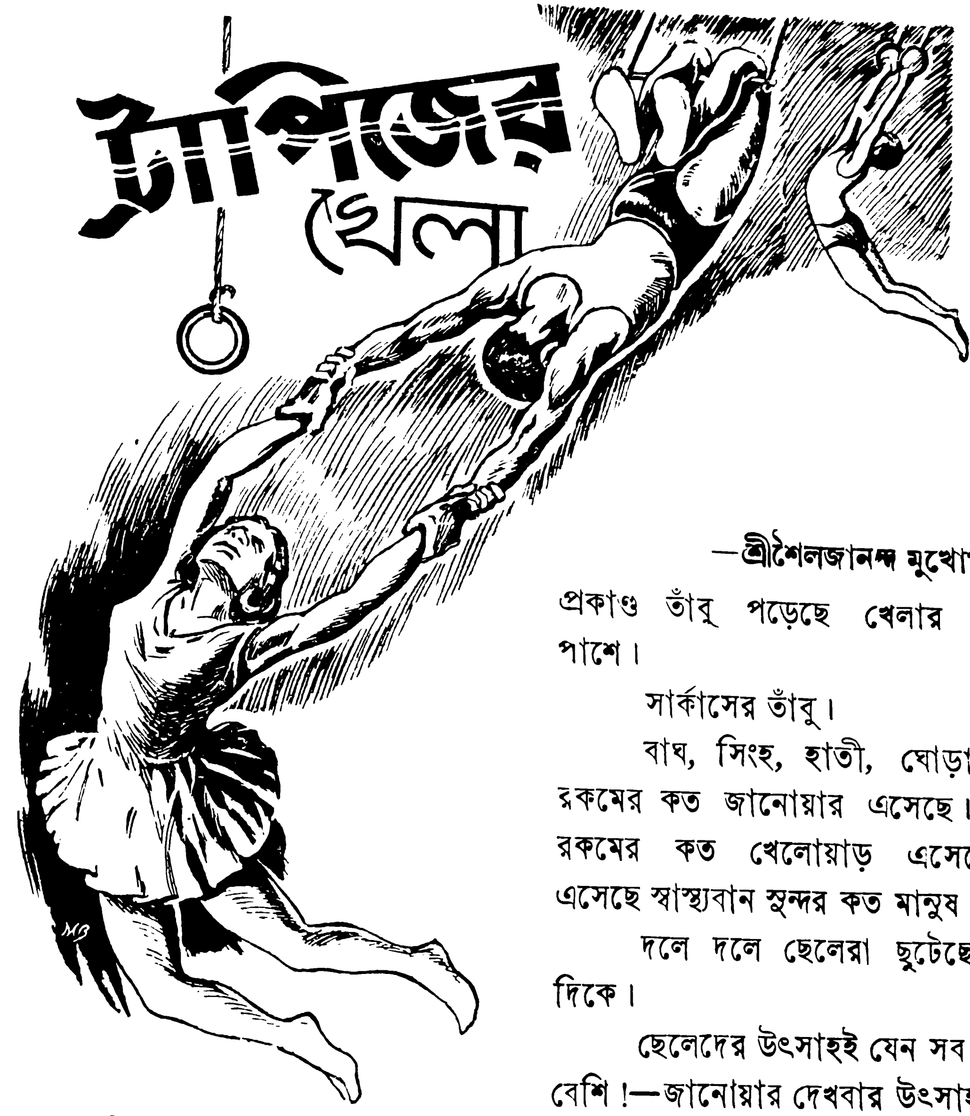

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছে খেলার মাঠের পাশে।

সার্কাসের তাঁবু।

বাঘ, সিংহ, হাতী, ঘোড়া—কত রকমের কত জানোয়ার এসেছে। কত রকমের কত খেলোয়াড় এসেছে!—এসেছে স্বাস্থ্যবান সুন্দর কত মানুষ!

দলে দলে ছেলেরা ছুটেছে সেই দিকে।

ছেলেদের উৎসাহই যেন সব চেয়ে বেশি!—জানোয়ার দেখবার উৎসাহ!

সার্কাসের খেলা হবে তাঁবুর ভেতর। চারিদিকে কত রঙ-বেরঙের আলো জ্বলবে। টিকিট না কিনে ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ।

তার চেয়ে বড় কথা—জন্তু-জানোয়ার দেখতে টিকিট কিনতে হবে না।

কিন্তু সেখানেও এক বিপদ। একে তো বিদ্‌কুটে গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়, তার ওপর খুঁটি পুঁতে নারকেলের দড়ি বেঁধে দূরে একটা বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাছে গিয়ে যে ভাল ক'রে দেখবে তার উপায় নেই।

ছেলেদের মধ্যে একটু বড় যারা—তাদের মধ্যে রীতিমত তর্ক সুরু হয়ে গেছে।

—বিলিতি সার্কাস দেখেছিস ?

—না।

—তবে আর কি দেখলি ? তাদের ছিল দশটা ইয়া বড় বড় হাতী, আর দশটা সিংহ। কেশরওয়ালা সিংহ, দেখলে মনে হয় বিলেতের জঙ্গল থেকে এই মাত্তর ধরে' আনলে।

একজন প্রতিবাদ করলে ঃ—সিংহের কেশর থাকে না, কেশর থাকে সিংহীর।

আর-একজন বললে ঃ বিলেতের জঙ্গলে সিংহ পাওয়া যায় না। সিংহ থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে।

—তুই গেছিস্ কোনোদিন বিলেত ?

—বিলেত যাবার দরকার হয় না। বইএ পড়েছি।

এই নিয়ে তুমুল তর্ক, প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি, তারপর সেকথা গিয়ে উঠলো ইস্কুলের হেডমাষ্টারের কানে। হুকুম হয়ে গেল, ছেলেরা বিনা প্রয়োজনে কেউ সেখানে যাবে না।

সার্কাসের মালিক দেখলেন—বিপদ হলো তাঁরই। কারণ, ছেলেরাই সার্কাস দেখতে বেশি ভালবাসে। তারাই তার বড় খরিদ্দার। এই রকম বিধি-নিষেধ থাকলে হয়ত-বা তারা সার্কাস দেখতেও আসবে না।

সেই দিনই তিনি সারা শহরে ঢোল-শহরৎ করে' জানিয়ে দিলেন—কুড়ি বৎসর বয়সের ছেলে পর্য্যন্ত সকলের টিকিটের দাম সব সময়েই আট আনা। তার ওপর ছেলেরা যখন যে-সময় আসবে, কোম্পানীর লোক তাদের প্রত্যেক জানোয়ারটি দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে—কোথায় কোন্ সময় কিরকম করে' তাকে ধরা হয়েছে, কেমন করে' তাকে পোষ মানিয়ে খেলা শেখানো হয়, সে কি খায়, কত তার বয়স—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভদ্রলোক ব্যবসা বেশ ভালই বুঝেন। এতেও তিনি নিরস্ত হলেন না। নিজে হেড-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করলেন। ইস্কুলের প্রত্যেকটি শিক্ষককে বিনা পয়সায় একদিন সার্কাস দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করে' এলেন। বলে এলেন ঃ এখান থেকে চলে যাবার আগে একদিন রবিবার দিনের বেলা শুধু শিক্ষক ও ছাত্রদের বিনামূল্যে খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

হেড-মাষ্টারমশাই সেই দিনই একটা সার্কুলার লিখে প্রত্যেক ক্লাসে পাঠিয়ে

দিলেন।—আজ থেকে সার্কাস-গ্রাউণ্ডে যাবার সর্ব্বপ্রকার বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করে' নেওয়া হ'লো।

নবম শ্রেণীর ছাত্র সুজিতের আনন্দ যেন আর ধরে না!

একে তো সার্কাস দেখবার টিকিটের দাম আট আনা করে' দেওয়া হয়েছে, তার ওপর যখন খুশী সেখানে সে যেতে পারবে।

সুজিতকে চেনে না—সেরকম ছেলে ইস্কুলে এক রকম নেই বললেই হয়। সব সময়েই দেখা যায়—লাল রঙের জামা গায়ে, পায়ে একজোড়া চটি আর হাতে একটি চাকু-ছুরি। বাঁশের কঞ্চি, এক টুক্‌রো কাঠ, নয়তো পেন্সিল, আর হাতের কাছে কিছু না পেলে নিজের আঙুলের নখ—দেখা যায় সে কাটছেই।

তার কথার ওপর কথা যে বলবে—মার সে খাবেই। সে যা বলবে, তা যেন বেদবাক্য—অকাট্য! এম্‌নি তার স্বভাব।

এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠতে সে যেন কিছুতেই চায় না! সুজিতের সঙ্গে নীচের ক্লাস থেকে পড়েছে এমন-সব সহপাঠীদের মধ্যে দু'একজন বি-এ পাশ করেছে। সেকথা বললে সুজিত কিন্তু রাগ করে না—হাসে।

ক্লাসে কোনও ছেলে হয়ত' পড়া বলতে পারেনি, কিংবা হয়ত' দুষ্টুমি করেছে, তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন; তৎক্ষণাৎ ডাক পড়ে সুজিতের।

বাঁশের কঞ্চি কিংবা বেত নিয়ে সুজিত প্রস্তুত।

শিক্ষকের হাতের কাছে সেটি পৌঁছে দিতে তার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না!

ছেলেটি মা'র খাবে, কাঁদবে, সুজিত একাগ্র দৃষ্টিতে তাই দেখবে আর হাসবে। সে যে তার কি আনন্দের হাসি, নিজের চোখে না দেখলে তা বুঝানো সম্ভব নয়।

এইখানেই সুজিত সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র!

প্রত্যহ দেখা যায়, সুজিত আট আনা দিয়ে টিকিট কিনে সার্কাস দেখছে।—সেই লাল জামা, পায়ে চটি, হাতে ছুরি!

সার্কাস কোম্পানীর যে-লোকটি টিকিট বিক্রি করে, তার সঙ্গে ভাব করতে সুজিতের মোটেই দেরি হয়নি। প্রত্যহ ঠিক একই জায়গার একখানি টিকিট সে সুজিতের জন্য রেখে দেয়। দূর থেকে লাল জামা দেখবামাত্র সে তার টিকিটখানি

ঘুলঘুলির পথে বাড়িয়ে ধরে। হাসতে হাসতে টিকিট নিয়ে সুজিত তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে।

টিকিট কেনবার জন্য সুজিতকে কোনোদিন কিউ-এ দাঁড়াতে হয় না।

সুজিতকে কেউ যদি প্রশ্ন করেঃ রোজ রোজ একই খেলা দেখতে তোর ভাল লাগে?

সুজিত বলেঃ না।

—তবে যাস্ কেন?

—কেন যাই? বলে' সুজিত সে-প্রশ্নের যা জবাব দেয়, সে-ও এক বিচিত্র!

তাঁবুর মাথার ওপর মোটা মোটা দড়ি দিয়ে কয়েকটি লোহার 'রড্' আর 'রিং' ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'জন বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ আর একটি মেয়ে—এই তিনজনে ওই রড্ আর রিং ধরে' ট্রাপিজের খেলা দেখায়। কত রকমের কত খেলা!—অপূর্ব্ব! অদ্ভুত!

এক প্রান্তের রিং ধরে' ঝুলতে ঝুলতে অপর প্রান্তের 'রিং'টাকে গিয়ে যখন ধরে, মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে দু'দিকে দু'জন যখন একটিমাত্র হাতের ওপর ভর দিয়ে শূন্যে ঘুরপাক খায়, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তখন নির্বাক হয়ে যেতে হয়!

দৈবাৎ কোনোদিন যদি চোখের নিশানা বেফাঁস্ হয়ে গিয়ে একবার ফস্‌কে যায় তো—বাস্, আর দেখতে হবে না! তিন জনেই তাল্‌গোল্ পাকিয়ে ওই অত দূর থেকে একেবারে নীচে!

সুজিত বলেঃ আমি শুধু সেই জন্যেই যাই!

—কি জন্যে?

—ওদের পড়ে যাওয়া দেখতে।

একদিন-না-এক্‌দিন হাত ফস্‌কে পড়বেই।

কিন্তু পড়লো না একদিনও।

খেলা যারা দেখায় তাদের চোখের নিশানা অভ্রান্ত, না আমাদের সুজিতের দুর্ভাগ্য, কে-জানে?

রোজ রোজ সেই একই খেলা দেখে দেখে এমন হ'লো যে সুজিতের খেলা দেখার আর কোনও আনন্দই রইলো না।

সুজিত প্রতিজ্ঞা করে' বসলো—আর সে দেখবে না।

দশবার দেখেছে পাঁচটাকা খরচ করে'। পড়বার হ'লে এর মধ্যে একদিন নিশ্চয়ই পড়তো।

সুজিত সেদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ীতে বসে রইলো। কাজ কি রাস্তায় বেরিয়ে? যদি লোভ সম্বরণ করতে না পেরে টিকিট কিনে বসে!

কিন্তু হা ভগবান! এ কি করলে তুমি?

পরের দিন সকালে উঠেই শুনলে, গত কাল যখন সার্কাসের খেলা দেখানো হচ্ছিল, তখন নাকি একটা ভয়ঙ্কর রকম দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!

সুজিত তার নিজের কানটাকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলে না! কি এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে জানবার জন্য বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে পড়লো।

একটা দুর্ঘটনা যে ঘটেছে সেকথা সত্য, কিন্তু কি ঘটেছে তার সঠিক সংবাদ কেউ দিতে পারলে না।

সুজিত ঢুকলো একটা চায়ের দোকানে।

দোকান একেবারে সরগরম! এই আলোচনাই হচ্ছিল সেখানে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বললেঃ আমি নিজে দেখেছি।

চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে সুজিত তার সুমুখে গিয়ে বসলো।

সে তখন বলে চলেছেঃ বাঘের খেলা শেষ হবার পর, দু'জন ছোক্‌রা আর তাদের মাঝখানে একটি মেয়ে হাত-ধরাধরি করে' এসে দাঁড়ালো।

সুজিত বললেঃ ট্রাপিজের খেলা দেখাবার জন্যে?

লোকটি বললেঃ হ্যাঁ। তাঁদের মধ্যে সব-চেয়ে যিনি ভাল খেলা দেখান—ফর্সা গায়ের রং, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, চমৎকার চেহারা!

সুজিত যেন তাকে তার চোখের সামনে দেখতে পেলে। বললেঃ তারই 'এক্সিডেন্ট'?

—হ্যাঁ, তাঁরই। সবাইকে নমস্কার করে' হাসতে হাসতে লাফিয়ে তিনি ধরলেন পূবদিকের রিংটা, তারপর বারকতক্ সেইখানে পাক্ খেয়ে রিংটা দুলিয়ে দিয়ে বোধহয় তিনি ধরতে চেয়েছিলেন তাঁবুর একেবারে শেষে পশ্চিম দিকে যে রিং ঝুলছিল সেই রিংটা। ধরতে গিয়ে তাঁর হাতের তাক্ গেল ফস্‌কে ছিট্‌কে, গিয়ে পড়লেন গ্যালারির নীচে। হৈ হৈ করে' সব উঠে পড়লো। চারিদিকে লোক জড়ো হয়ে গেল। ভিড় ঠেলে সার্কাসের লোকেরা তক্ষুনি তাঁকে ধরাধরি করে' ভেতরে নিয়ে চলে গেল। সার্কাস ভেঙ্গে গেল।

সবাই তাকে ধরে' বসলো ঃ লোকটার কি হ'লো শেষ পর্য্যন্ত দেখলেন না ?

সে বললে ঃ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, দেখতে আর গেলুম কই! শুনলুম, তক্ষুনি তাঁকে সরকারি হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে। কেমন আছে কে জানে ?

সুজিতের চা খাওয়া বোধহয় হ'লো না। হাত থেকে চায়ের কাপ্‌টা সেইখানে নামিয়ে দিয়েই বলে উঠলো ঃ এতক্ষণ মরে' গেছে।

সুজিতের আফ্‌শোষের আর বাকি কিছু রইলো না। যা দেখবার জন্যে সে এক-আধবার নয়, রীতিমত পয়সা খরচ করে' দশ-দশবার সার্কাস দেখলে, আর যেদিন যাওয়া বন্ধ করলে, সেই দিনই এক্সিডেণ্ট!

সুজিত তৎক্ষণাৎ ছুটলো সরকারি হাঁসপাতালে।

শহর যেমন ছোট, তার হাঁসপাতালও তেমনি।

সেখানে যাওয়ামাত্র সুজিত দেখলে, একটি ছোট্ট ঘরের ভেতর সেই ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। লাল কম্বলে মোড়া তাঁর সর্ব্বশরীর। শিয়রের কাছে ছোট্ট একটি টুলের ওপর বসে আছে সেই মেয়েটি। এই মেয়েটিকে সুজিত প্রতিদিন দেখেছে ট্রাপিজের খেলা দেখাতে। যিনি পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন, এই মেয়েটি তাঁর প্রতিদিনের খেলার সঙ্গিনী। জীবনের সঙ্গিনী কিনা তাই-বা কে জানে ?

সুজিতের মনে হ'লো যেন মেয়েটি সারারাত ধরে' তাঁর শুশ্রূষা করেছে। চোখে ঘুম যেন এখনও লেগে রয়েছে!

ঘরের দোর পর্য্যন্ত সুজিত এগিয়ে গেল। যিনি শুয়ে আছেন তিনি ঘুমুচ্ছেন। সুজিত জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ঃ উনি—কেমন আছেন ?

মেয়েটি নীচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখলে সুজিতকে। তার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে সুজিতের দিকে মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে তার কাছে এলো। এসেই বললে ঃ হ্যাঁ তুমি! তুমিই নিশ্চয়। এই লাল জামা, এই মুখ! তোমাকে রোজ আমি দেখেছি খেলা দেখাবার সময়। রোজ টিকিট করে' গ্যালারির ঠিক একই জায়গায় তুমি বসতে—না ?

সুজিত বললে ঃ হ্যাঁ।—কিন্তু ওঁর কি হয়েছে ? কেমন আছেন উনি ?

মেয়েটি বললে ঃ ওঁর ডান হাতটা গেছে ভেঙ্গে। হাতটা বোধহয় চিরদিনের মত অকেজো হয়ে গেল।

সুজিত বুঝতে পারছিল না—ওর হাত ভাঙ্গার সঙ্গে তার রোজ সার্কাস দেখতে যাওয়ার কি সম্বন্ধ!

এরা তাহ'লে তাকে বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছে!

সুজিত মনে মনে খুব আনন্দিত হলো। জিজ্ঞাসা করলেঃ এখন কেমন আছেন উনি?

মেয়েটি বললেঃ ভাল আছেন। ভেবেছিলাম, হাতটা বোধহয় কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—তা আর হবে না। কিন্তু জানো—তোমার অবশ্য কোনও দোষ নেই—ওঁর ওই হাত ভাঙ্গার জন্য তুমিই দায়ী।

সুজিত অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বললেঃ আমি?

মেয়েটি বললেঃ হ্যাঁ। পড়ে গিয়েই উনি অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে এলো এই হাঁসপাতালে। তখন উনি বললেনঃ খেলা দেখাবার সময় গ্যালারিতে রোজ ঠিক একই জায়গায় লালরঙের জামা পরে একটি ছেলেকে উনি দেখতেন। কাল সে ছেলেটিকে উনি দেখতে পেলেন না। বাস্, চোখের দৃষ্টি এক সেকেণ্ডের জন্য অন্য দিকে যেই চলে গেল—হাতের নিশানা গেল ফস্কে। রিংটা ধরতে পারলেন না। উনি পড়ে গেলেন।—তুমি রোজ যেতে, কাল শুধু যাওনি—না?

সুজিত বললেঃ হ্যাঁ।

মেয়েটি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেঃ কাল যদি যেতে, ওঁর এই এক্সিডেণ্ট্টা হ'তো না।

কিন্তু কেন সে যায়নি, সেকথা বলা চলে না।

এক্সিডেণ্ট্ তারই জন্য হয়েছে শুনে কেমন যেন একটা বিজাতীয় আনন্দে সুজিতের সমস্ত মন ভরে' গেল। আবার তেমনি আফ্শোষও তার কম হ'লো না—পড়াটা সে নিজের চোখে দেখতে পেলে না বলে'।

সুজিত বোধহয় এই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে' বসলোঃ হাতটা কখন কাটবে?

মেয়েটি বললেঃ কাটতে বোধহয় হবে না।

সুজিত কেমন যেন হতাশ হয়ে গিয়ে বললেঃ হবে না?

মেয়েটি শুধু 'না' বলে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

সুজিতকেও ফিরতে হ'লো বাধ্য হয়ে। কিন্তু এতদূর থেকে পড়েছে গ্যালারির ওপর—হাতটা গেছে ভেঙ্গে, অথচ ভেতরের হাড় ভাঙ্গেনি—এও কি কখনও সম্ভব?

হাড়ের কুচি ভেঙ্গে ভেতরে থেকে যাবে? তা কখনও হয় না। ডাক্তার নিশ্চয়ই কাটবে, কেটে বের করে' দেবে ভাঙ্গা হাড়ের টুকরো।

এখানকার ডাক্তার তেমন বড় ডাক্তার নয়, তার ওপর কাটাকুটির যন্ত্রপাতিও এখানে সেরকম নেই, তাই বোধহয় কাটার কথাটা ডাক্তার চেপে যাচ্ছে।

সুজিত সারা পথ শুধু এই কথাই ভাবতে ভাবতে এলো। সে যেন তার চোখের সামনে দেখতে পেলে, টেবিলের ওপর শুইয়ে লোকটাকে অজ্ঞান করে' ফেলা হয়েছে, তারপর করাত দিয়ে হাতটি তার কাটছে। চারিদিকে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। ওই মেয়েটি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে·········

সুজিতের পরিচিত একজন লোক পেরিয়ে যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। সুজিতকে দেখেই সে বলে' উঠলোঃ কি হ'লো সুজিত? আপন মনেই হাসতে হাসতে যাচ্ছো কেন?

সুজিত বুঝতেই পারেনি যে সে হাসছে।

'কিছু না।' বলে' সে চলে গেল।

মনে-মনে কল্পনায় যে ছবি এঁকে সুজিত আনন্দ পাচ্ছিল, তার ছায়া পড়েছে তার মুখে। তা হবেও-বা। ইংরেজি একটা বই-এ পড়েছিলঃ Face is the index of mind.

কথাটা সত্য কি-না দেখবার জন্যে রাস্তার মোড়ে পানের যে দোকানটা ছিল, সেইখানে গিয়ে সে দাঁড়ালো। দোকানে বড় একটা আর্শীতে তার মুখের ছায়া পড়েছে :—নাঃ, পরের মন্দ ভাবা উচিত নয়।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করলেঃ কি দেখছো?—কোথায় গিয়েছিলে—সকাল-বেলা?

সুজিত তৎক্ষণাৎ বললেঃ হাঁসপাতালে। জানো তো সার্কাসে খেলা দেখাতে গিয়ে একটা লোক পড়ে গিয়েছিল······

—কেমন আছে সে?

সুজিত বললেঃ ওর আর থাকাথাকি কি? মরার মতন পড়ে আছে। হাতটা কেটে ফেলতে হবে। বাস্, হাতটা কাটলে কি আর বাঁচবে? মরে যাবে।

আর্শীতে তাকিয়ে দেখলে; সুজিতের মুখখানা আনন্দে আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

———

বীর-প্রণাম

—শ্রীমানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশের কেল্লা ধরার 'পরে গড়লো তিতুমীর
নয়া ভারতের প্রথম শহীদ—সন্ধানী মুক্তির।
অধীনতার দুঃখ-জ্বালায় দিল প্রথম প্রাণ,—
বাংলার ছেলে গাইল একাই জীবনের জয়গান।
করিল ঘোষণা বীর তিতুমীর ঃ "স্বরাজ আমরা চাই,—
মানুষ আমরা—বাঁচার শক্তি আমাদেরও আছে ভাই।"
ভারতে তখন চলিতেছে জোর ওহাবী আন্দোলন,—
"ইংরেজদের করো উৎখাত্"—লাখো মানুষের পণ।
সেই সংগ্রামে দিল যোগ ভাই বাংলার তিতুমীর—
আজ সে কাহিনী শোনো গো কিশোর প্রথম বিদ্রোহীর ॥

তখনো ব্রিটিশ নেয়নি স্বহাতে দেশের শাসন-ভার—
বানিয়ার দল দেশেতে চালায় ভীষণ অত্যাচার!
এমনি সময়ে জাগে তিতুমীর—ইংরেজ ভয়াতুর—
হাজারো হাজারো মানব-কণ্ঠে জাগে মুক্তির সুর ॥

ইংরেজ দল চুপি নিঃসাড়ে শুরু করে পরামর্শ—
কোন্ ছলে তারা জিতিবে এবার আসন্ন সংঘর্ষ!
ইংরেজ ফেলে কৌশল-জাল—জাগে বিদ্বেষ-বিষ—
তবু ওগো জাগে বাংলার বুকে আঠারোশো একত্রিশ!
সুদক্ষ শত গোরা-পল্টন বের হলো এই রণে—
বান্‌চাল হলো তাহাদের ছল তিতুর আক্রমণে।

স্বরাজ-যজ্ঞে জীবন সঁপিতে তিতু হলো আগুয়ান—
কাপুরুষ যত বানিয়ার দল পালিয়ে বাঁচায় প্রাণ !!

তারপর তারা মূল ঘাঁটি থেকে আনে লাখো সৈনিক—
রণ-প্রান্তরে স্বরাজের হোমে আগ্ জ্বলে ধিকিধিক্।
সুমুখ রণেতে পরাজয় জেনে পিছু হটি' তিতু বীর
তেঁতুলিয়া গাঁয়ে বাঁশের কেল্লা গড়ে করি উঁচু শির !
বানিয়ার দল কেল্লা-সুমুখে দাঁড়াতে গো নাহি পারে—
মুক্তিযাগের পুরোধার সাথে কেবলি যায় গো হেরে !
এমনি সময়ে নিঠুর বিধাতা নিদয় অকস্মাৎ,
রবি-বিদায়ের সঙ্গেই এলো ঝঞ্ঝার কালোরাত।
ঘূর্ণিবায়ুতে বাঁশের কেল্লা উড়ে গেল দূরাকাশে
ঘন কালোমেঘ উদিল অচিরে মুক্তির ইতিহাসে !
বন্দী হইল—প্রাণ দিল তিতু, দমিল না এতটুক,
ইতিহাসে একা আলো করি গেল জন্মভূমির মুখ ॥

সেই শহীদের পদছাপ ধরে বাংগালী আগুয়ান,
মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে, পণ করিয়াছে প্রাণ !
একে একে জাগে নীল-বিদ্রোহ, সিপাহী-মুক্তিরণ,
বংগ-ভংগ রোধ করিবারে জাগে রাখী-বন্ধন !
সন্ত্রাসবাদ-অসহযোগ—এমনই আগুনশিখা
তিতুমীরে স্মরি' দেশের ললাটে জাগালো রক্তটীকা !
ওগো তিতুমীর ! স্বাধীনতা-আলো জ্বালিলে ক্ষুদ্র বলে,
আজো তাই নত কোটি কোটি শির তোমারি চরণ-তলে !

——

বারুদ-ভরা বই

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পেন্‌সীল্‌ভেনিয়ার এক ছোট ষ্টেশন। প্রায় সারা রাত জেগে ষ্টেশনমাষ্টার তাঁর আফিসের কামরায় ইজি-চেয়ারে ক্লান্ত দেহটি মাত্র এলিয়ে দিয়েছেন, এম্‌নি সময় মেয়েদের বিশ্রাম-কক্ষ হতে হঠাৎ কতকগুলো শিশুর কান্না তাঁর কানে ভেসে এলো।

প্রথমে কিছুক্ষণ তা অবহেলা করবার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। কারণ, সারাজীবনে তিনি যাত্রী তো কম দেখেন নি! কেউ হাসবে, কেউ কাঁদবে, এতে আর নতুনত্ব কি আছে? কাজেই দৈনন্দিন জীবনের এসব ঘটনাকে উপেক্ষা করাই সঙ্গত। চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, কিন্তু মনে হলো, কান্নার মাত্রা যেন ক্রমশঃই চড়া হয়ে উঠছে!

অগত্যা, তাঁকে যেতেই হলো। ব্যাপার কি তার অনুসন্ধান তাঁকে করতেই হবে।

—"কে আপনি? এখানে যে মেছোহাট মিলিয়ে বসেছেন! ব্যাপার কি? কি নাম আপনার?"

ষ্টেশনমাষ্টার এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি প্রশ্ন করে বসলেন!

হঠাৎ ষ্টেশনমাষ্টারের আগমনে মহিলাটি খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে তাঁর দিকে মুখ তুলে বললেন, "আমি—আমি—আমার নাম মিসেস্‌ হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোয়ে। আমি ভোরের আপ্‌-গাড়ীর অপেক্ষা করছি। কি করবো স্যার, আমি এই ছেলেমেয়েদের কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। আমায় ক্ষমা করবেন স্যার!"

—"না, না, ওসব ক্ষমা-টমার কথা আমার কাছে হবে না। হয় এখান থেকে বেরিয়ে যান, নয়তো ওদের শান্ত করুন।"

অতি অসহায় ও করুণ ভাবে মহিলা তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন, "চেষ্টা তো খুবই করছি, কিন্তু পারছি না কিছুতেই। আর, ওদেরই বা কি দোষ দিব বলুন! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আর আজ শীতটাও বড্ড কন্‌কনে। কাজেই শান্ত হচ্ছে না কিছুতেই—"

—"তা হলে বেরিয়ে যান, এক্ষুণি বেরিয়ে যান।"

ষ্টেশনমাষ্টারের বজ্র-আদেশ সেই 'ওয়েটিং-রুমে'র এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

মহিলাটি অতি অসহায় ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কি যে করবেন তিনি, কিছুই ঠিক্‌ করতে পারলেন না।

মহিলার এই মৌন ভাব দেখে, ষ্টেশনমাষ্টারের ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি তক্ষুণি ভেঙে গেলো!

তিনি এবার আরো উচ্চস্বরে বললেন, "কি, যাবেন আপনি? স্বেচ্ছায় যাবেন? না, বের করে দিতে হবে লোক দিয়ে?"

হতভাগিনীর দু'চোখ দিয়ে এবার জলের ধারা নেমে এলো। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অভিভূত ভাবে বললেন, "ক্ষমা করবেন স্যার! আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। তার পরেই আমার গাড়ী এসে যাবে, আর আমিও চলে যাব। এই সামান্য সময়টা—"

—"এই কুলী! কুলী! চাপ্‌রাশী!—"

ষ্টেশনমাষ্টারের আহ্বানে কুলীরা এসে গেলো চার-পাঁচ জন। তারপর প্রভুর আদেশে তারা যে কাজ করে বস্‌লো, সে রকম ঘটনা পৃথিবীতে বিরল না হলেও মানবতা কোন দিনও তার পোষকতা করে নি!

মহিলার শত কাকুতি-মিনতি সত্বেও, ষ্টেশনমাষ্টারের নিষ্ঠুর আদেশে কুলীর দল তাঁর জিনিষ-পত্র সব কিছু ওয়েটিং-রুমের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, ছেলেমেয়েগুলিকে টেনে-হিঁচড়ে বসিয়ে দিল প্ল্যাটফর্ম্মের উন্মুক্ত হাওয়ার মধ্যে, তারপর মহিলার সম্মুখে এসে সোজা দাঁড়িয়ে বললো, "যাও, বাইরে বেরিয়ে যাও। নয়তো অপমানিত হবে।"

অপমান? অপমানের আর বাকিই বা ছিল কতটুকু? তবু, পাছে তারা বলপ্রয়োগে তাঁকেও হাত ধরে টেনে বার করে দেয়, এই আশঙ্কায়, মহিলা নতমুখে ও নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

চোখে তাঁর তখনো অজস্র জলের ধারা!—

শিশুদের কান্না ওতে থামেনি বটে, বরং দ্বিগুণ ভাবে বেড়েই চল্‌ছিল, তবু অসহায় দুর্ব্বলকে লাঞ্ছিত করেই প্রবলের পরম তৃপ্তি!

দরিদ্রা মহিলাও সেদিন এই চরম অভিজ্ঞতাই লাভ করলেন যে,—প্রবল যে, সে চিরদিনই দুর্ব্বল দারিদ্র্যকে আঘাত করবার ফিকির খুঁজে বেড়ায়, অসহায় দুর্ব্বলকে বাঁচতে দেওয়া বা তাকে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া প্রবলের উদ্দেশ্য নয় একেবারেই!

কিন্তু—এর কি কোন প্রতিকার নেই?

মহিলার মনে-প্রাণে বুঝি সেদিন সর্ব্বপ্রথম এক ক্ষুব্ধ ঝটিকার উত্তাল হাওয়া অন্তস্তলে বইতে সুরু করেছিল!

মিসেস্ ষ্টোয়ের মনে সেদিন তাঁর গত জীবনের কথা উদয় হয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু হলেও তা যে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

মিসেস্ ষ্টোয়ে খুব উচ্চশিক্ষিতা না হলেও লেখাপড়া জানতেন। শুধু তাই নয়, প্রথম জীবনে তিনি এক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজও করেছিলেন। কিন্তু পরে কেমন করে তাঁর ভাবুক মনের মধ্যে এক কপর্দ্দকহীন শিক্ষিত অধ্যাপকের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, আর তার ফলে তিনি সেই অধ্যাপককে বিয়ে করে চির-দারিদ্র্য বরণ করে নেন।

তারপর ধীরে ধীরে কত বছর কেটে যায়, আর তিনি একে একে সাতটি সন্তানের জননী হয়ে দারিদ্র্যকে ক্রমশঃই তাঁর অন্তরঙ্গ সাথী করে নিয়েছিলেন !

নিঃস্ব দরিদ্রের আবার মান-সম্মান কেন থাকবে ? মিসেস্ ষ্টোয়েরও তাই মান-সম্মান লাঞ্ছিতই হচ্ছিল দিনের পর দিন ! ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার থেকে কুলীরা পর্য্যন্ত তাই তাঁকে অপমান করে, ষ্টেশনের কামরা থেকে বের করে দিতে সাহসী হয়েছিল !

মিসেস্ ষ্টোয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতাকে ভুললেন না একবারও, তিনি তাঁর মনের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে রেখে দিলেন সেই অভিজ্ঞতা !

সুদূর অতীতের কথা হলেও, সেযুগেও সংবাদ-পত্রের অভাব ছিল না। মিসেস্ ষ্টোয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই সব খবরের কাগজ পড়তেন, আর সংবাদ সংগ্রহ করতেন পৃথিবীর কোথায় কোন্ অংশে দুর্ব্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার অবাধে চলে আস্‌ছে !

খবর শুনতেন তিনি—আমেরিকার দক্ষিণ অংশে ত্রিশ লক্ষ নিগ্রো ক্রীতদাস শ্বেতাঙ্গ মনিবদের ঘরে ঘরে নির্ম্মম অত্যাচার মাথায় নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে !

এ খবরও তাঁর অজানা রইলো না যে, একমাত্র নিউ-অর্লিয়েন্সের হাটেই, প্রতিবছর শীতকালে সাত হাজার নর-নারীকে ছাগল-ভেড়ার মতো কেনাবেচা করা হয়।

মিসেস্ হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোয়ে

মানুষ মানুষকে পণ্যদ্রব্যের মতো কেনাবেচা করবে আর সেই সব সদ্য-কেনা নর-নারীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে বসবে, ও কঠিন অত্যাচারে ঐসব ক্রীতদাস-দাসী অথর্ব্ব-পঙ্গু হয়ে অবশেষে ইহলোক পরিত্যাগ করে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌বে, এই দুঃসহ অবস্থার চিন্তা তাঁকে প্রায় অভিভূত করে তুললো !

১৮৫১ সালের এক শীতের প্রভাতে গির্জ্জায় গির্জ্জায় যখন প্রভু যীশুখৃষ্টের প্রার্থনা হচ্ছিল, তেম্‌নি সময় মিসেস্ ষ্টোয়ের চোখের সম্মুখে যেন এক করুণ দৃশ্য ফুটে উঠলো !

জাগ্রৎ অবস্থায়ই স্বপ্ন দেখলেন তিনি, এক শ্বেতাঙ্গ মনিব তার বৃদ্ধ ক্রীতদাসকে নির্ম্মম ভাবে ক্রমাগত চাবুক মেরে যাচ্ছে ! হতভাগার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো, তার দেহের সর্ব্বত্র যেন রক্তের নদী বয়ে যেতে সুরু করলো ! কিন্তু আশ্চর্য্য, হতভাগ্যের মুখ থেকে তবু একটা কাতরোক্তি বা অভিসম্পাত ফুটে বেরুলো না !

যন্ত্রণায় মুখ তার কুঁকড়ে গেলো বটে, নিষ্করুণ কশাঘাতে দেহ তার মাঝে মাঝে স্পন্দিত ও সঙ্কুচিত হয়ে আঁকুলি-বিকুলি খাচ্ছিল বটে, কিন্তু আর্ত্তনাদ বা সাহায্যের আবেদনে নিজেকে সে হীন করে তুললে না একবারও! অথবা নির্দ্দয় মনিবের বিরুদ্ধে একবারও সে ঈশ্বরের দরবারে কোন বিচার প্রার্থনা করলে না।

সে বরং তার অত্যাচারী মনিবকে ক্ষমা করবার অনুরোধই জানিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে!

চমকে গেলেন মিসেস্ ষ্টোয়ে! মনে তাঁর জেগে উঠলো এক শাশ্বত জিজ্ঞাসা। ভাবলেন তিনি, সুসভ্য আমেরিকানদের এই কি তবে ভবিষ্যৎ? উৎপীড়িত দুর্ব্বলের অভিসম্পাত নিয়ে, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত আমেরিকানরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কয়দিন? আর এই লাঞ্ছিত অপমানিত হতভাগ্যের দলই বা তাদের অত্যাচারী মনিবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রভু যীশুর জয়ধ্বনি করবে কেমন করে? তা ছাড়া, স্বর্গের দেবতাই বা এমন পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করবেন কত কাল? প্রবল কি দুর্ব্বলের ওপর চিরদিনই এম্‌নি ধারা অত্যাচার চালিয়ে যাবে, আর অসহায় দুর্ব্বলের দল তা নীরবে সহ্য করে যাবে চিরকাল?

এম্‌নি কত প্রশ্নই সেদিন মিসেস্ ষ্টোয়ের বুকের দুয়ারে যেন হাতুড়ি পিট্‌তে সুরু করে দিলে! তিনি অর্দ্ধ-উন্মাদিনীর মত প্রবলের অত্যাচার কল্পনা করে উত্তেজিত হতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি হাতে তাঁর কলম তুলে নিলেন, তারপর কল্পনায় বিভোর হয়ে ক্রীতদাস-দাসীদের ওপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নির্ম্মম অত্যাচার-কাহিনী তাঁর সেই কলমের মুখে ফুটিয়ে তুলতে সুরু করলেন!

স্থির করেছিলেন তিনি, স্বামীর উপার্জ্জনের সঙ্গে নিজের লেখা সেই পুস্তক-বিক্রীর অর্থ মিলিয়ে, হয়তো কিছু সচ্ছল ভাবেই সংসার চালাতে সমর্থ হবেন!

সম্ভবতঃ এর বেশী আর কিছু সেদিন তিনি আশা করতে পারেন নি! দু'বেলা দুমুঠো আহার মাত্র—তবে একটু সচ্ছল ভাবে! ব্যস্, শুধু এই পর্য্যন্ত!

স্বামী তাঁর লেখার খানিকটা পড়ে, উৎসাহ দিয়ে বললেন, "বেশ্ হচ্ছে, চালিয়ে যাও।"

দিনরাত পরিশ্রম করে মিসেস্ ষ্টোয়ে তাঁর বই শেষ করলেন। তারপর এক প্রকাশকের সঙ্গে বন্দোবস্ত অনুসারে, এক সাময়িক কাগজে তা ধারাবাহিকভাবে বেরোতে লাগ্‌লো।

প্রায় আট মাস তা চল্‌লো, কিন্তু শেষকালে এমন হলো সেই কাগজের চাহিদা যে,'প্রকাশক আর চাহিদা অনুযায়ী কাগজের সংখ্যা বাড়িয়ে ছাপাতে পারেন না! ফলে, কাগজ বেরোলে অনেককেই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

দেখতে দেখতে সারা আমেরিকায় এক যুগান্তর উপস্থিত হলো! মিসেস্ হ্যারিয়েট্ বীচার ষ্টোয়ের লেখা "টম্‌কাকার কুটীর" (Uncle Tom's Cabin) সকলেরই মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে পড়লো।

ক্রীতদাসের দল দেখলো, এ যে তাদেরই ছবি! তাদেরই ব্যথা-বেদনা, তাদেরই চোখের

জল, এর প্রতিটি অক্ষর অভিষিক্ত করে রেখেছে! তারা লেখিকাকে আশীর্ব্বাদ করলো মনে প্রাণে!

অত্যাচারী দাস-ব্যবসায়ীরা দেখলো, আর দেখলো উৎপীড়ক শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দল, যে নির্ম্মম অত্যাচার তারা করে এসেছে এতদিন, তা আর পাঁচিল-ঘেরা রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে নেই তো! তা এখন পৃথিবীর প্রকাশ্য দরবারে প্রতি নিয়ত মাথা খুঁড়ে বিচারের দাবী জানাচ্ছে!

তা ছাড়া, ক্ষমতার আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত, আর যথার্থ সুসভ্য মানুষ বলে যাঁরা গৌরব বোধ করতেন তাঁরা দেখলেন, মানবতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে ধনী দাস-ব্যবসায়ীদের নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে! শুনলেন তাঁরা, অগণিত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর দল যন্ত্রণায় অধীর হয়ে, তাদের আর্ত্ত চীৎকারে সুসভ্য মানব-সমাজের শান্তি ব্যাহত করছে! কাজেই এখনই তার কোন প্রতিকার করা প্রয়োজন!

এর ফলে আমেরিকার পথে ঘাটে জেগে উঠলো এক ঘরোয়া বিদ্রোহ। কেউ চাইলো, ক্রীতদাসের ব্যবসা জিইয়ে রাখতে হবে, নইলে তাদের টাকা আসবে কোত্থেকে? আর কেউ চাইলো, না, না, মানুষ বিক্রীর এই জঘন্য ব্যবসা তুলে দিতে হবে চিরকালের জন্য! নইলে এত রক্তপাত ও আর্ত্তনাদ আর সইতে পারা যায় না!

কাজেই এক তুমুল বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হলো! অর্থলোলুপ পৈশাচিক ব্যবসার সঙ্গে অশ্রুসিক্ত মানবতার লড়াই সুরু হয়ে গেলো!

অবশেষে দীর্ঘদিন পরে লড়াই যখন শেষ হলো, আমেরিকার ক্রীতদাস-মহলে তখন জেগে উঠলো বিপুল উল্লাস! তারা কেউ আর তখন ক্রীতদাস নয়, কেউ আর কারো তাঁবেদার নয়! আইনের বলে তারা ফিরে পেয়েছে তাদের অধিকার,—স্বাধীন মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার!

সকলেই তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, কোথায় সেই মহিলা যাঁর লেখা "টম্‌কাকার কুটীর" এমন এক অসাধ্য সাধনে ইন্ধন জুগিয়েছিল? কাজেই পেন্‌সীল্‌ভেনিয়ার ষ্টেশনে একদিন যে লজ্জাকর হীন ঘটনাটি ঘটেছিল মিসেস্ ষ্টোয়েকে কেন্দ্র করে, তার মাত্র কয়েক বছর পর, সেই মহিলাই যখন আবার কোন জরুরী কাজে রেলগাড়ীতে চেপে এক জায়গা থেকে অপর এক জায়গায় যাচ্ছিলেন, উৎসুক জনতা তখন পথিমধ্যে কয়েকবার তাঁর গাড়ী থামিয়ে, তাঁর দর্শন লাভ করে পরম কৃতার্থ বোধ করেছিল!

এমন কি, বিদেশে—ব্রিটেনে পর্য্যন্ত, উৎসুক জনতার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য পুলিশকে তাঁর গমন-পথের দুপাশে দড়ি বেঁধে, তাঁকে রাস্তা করে দিতে হয়েছে!

"আঙ্কল টমস্ ক্যাবিন" বা "টম্‌কাকার কুটীর" এ পর্য্যন্ত বিক্রী হয়েছে প্রায় তিন কোটি। আর দাস-ব্যবসায়ের প্রথা বন্ধ করবার জন্য আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে একদিন যে ঘরোয়া যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল, এই একখানি মাত্র বইই ছিল তার প্রধান কারণ।

কিন্তু নিয়তির কথা বলতে পারে কে? কলম যাঁর দেশের বুকে এম্‌নিভাবে একদিন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাঁর নিজের বেলায়ও বুঝি সেই আগুনই জমা হয়ে ছিল অদূর-ভবিষ্যতের জন্য!

অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে তাঁর এক ছেলে যেদিন অকালে মারা গেলো, মিসেস্ টেম্বে সেই দিন থেকেই হলেন উন্মাদিনী! ১৮৯৬ সালেও দেখা গেছে, আশীবছরের এক বৃদ্ধা রাজপথে যে কোন তরুণকে তার বুকে চেপে ধরে, নিজের হারানো ছেলে মনে করে, অভিভূত-ভাবে তাকে চুমু খাচ্ছে!—

—প্রবীরকুমার

শিক্ষক—হাঁ রে গজু, বানান্ করতো 'কপাল'!

গজু—আজ্ঞে, 'ক' আর 'ল'।

শিক্ষক—'পা' কই রে?

গজু—(নিজের পা দেখিয়ে) এই যে 'পা', স্যার!

× × ×

বাবা—বল্‌তো ভোম্বল, কোন্ জীব আমাদের দুধ দেয়?

ভোম্বল—গোয়ালা।

× × ×

খুকু—মা, আজ আমি পরীক্ষায় তৃতীয় হয়েছি।

মা—তোদের ক্লাশে কয়টি মেয়ে?

খুকু—কেন, তিন জন!

× × ×

শিক্ষক—বল্‌তো গণেশ, তোর পকেটে যদি চারটি পয়সা থাকে, আর পকেটের ছ্যাঁদা দিয়ে চারটি পয়সাই পড়ে যায়, তবে পকেটে কি থাকে?

ছাত্র—আজ্ঞে, একটি ছ্যাঁদা, স্যার!

আমরা

—শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

চলতি পথের আমরা সবে চলতি হাওয়ার ঘূর্ণি
আবর্জনার স্তূপের রাশি সংঘাতে দিই চূর্ণি'।
পথের বাধন বাঁধবে না
মোদের চলা থামবে না
শঙ্কাহরণ-শঙ্খ বাজে সকল আশায় পূর্ণি',
চলতি পথের আমরা সবে চলতি হাওয়ার ঘূর্ণি।

নিত্য-নবীন চঞ্চলতায় হর্ষে জাগে চিত্ত
দুখের দিনেও উছল হাসি সেই আমাদের বিত্ত।
ধরার বুকের গানগুলি
ফুলের মত লই তুলি',
জাগিয়ে হাসি বাজিয়ে বাঁশি আমরা জাগি নিত্য,
চিন্তাহরণ চঞ্চলতায় চলন্ত এই চিত্ত!

জীর্ণ ধরা কে বলে এই? নবীন এরে করবো,
নূতন ঊষার বিজয়-কেতন আমরা সবে ধরবো,
কিশলয়ের কুঞ্জবনে
হাসির বানে সন্তরণে
রঙের মেলায় আমরা রঙিন্ জয়ধ্বনি করবো,
চিরন্তনের নবীনতায় জয়ধ্বজা ধরবো!

———

টারজানের দ্বিতীয় এ্যাড্‌ভেঞ্চার

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

সেদিন টারজানের জীবনে এমন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে জেগে উঠলো তার মানুষের মন। জ্ঞান হওয়া থেকে সে নিজেকে দেখেছে, বনের পশুদের একজন রূপেই। সে যে মানুষ, পশুদের সঙ্গে মানুষদের যে কোন পার্থক্য আছে, অথবা তার মতন চেহারা যে পৃথিবীতে আর কোথাও আছে, তা তার ধারণাতেই ছিল না।

কিন্তু সেদিন দূর থেকে সেই শিকারী মানুষদের দেখে, তার নির্ব্বাক মনে এক বিচিত্র আলোড়ন জেগে উঠলো। জন্মসূত্রে সে মানুষ হয়েই জন্মেছে, মানুষের বিচিত্র মন নিয়েই জন্মেছে। পশুর মন যে-ঘটনায় যেভাবে সাড়া দেয়, মানুষের মন সে-ঘটনায় সেভাবে সাড়া দেয় না। মানুষের মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা, অনন্ত কৌতূহল।

তাই সেদিন প্রথম মানুষ দেখে টারজানের মনে এক অসীম কৌতূহল জেগে উঠলো। যদিও সে-কৌতূহলকে ভাষা দেবার মতন কোন ভাষাই সে জানতো না, কেন না, পশুর চীৎকার ছাড়া, মানুষের ভাষা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই তার ছিল না। জ্ঞানের প্রথম দিন থেকে সে শুনেছে পশুর চীৎকার; পশুর চীৎকারের একটা মানে আছে, যা পশুরাই একমাত্র বোঝে; টারজানও বোঝে সেই ভাষা।

তাই সেদিন বনের ভেতর তার বাসায় ফিরে গিয়ে, সে যেন কি রকম অস্থির আর চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার নিত্য সঙ্গী গেরিলা আর হাতীর দল তার সঙ্গে যেমন খেলা করতে আসে, তেমনি খেলা করতে এলো কিন্তু তাদের সে মেরে তাড়িয়ে দিলো। এ-রকম তো কখনো হয় না? তারা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে দূরে দাঁড়িয়ে টারজানকে দেখতে লাগলো। টারজানকে তারা ভালবাসে। পশু হলেও তারা ভালবাসে এবং মানুষের ধারণা নেই তাদের ভালবাসা কতখানি গভীর!

টারজান অস্থির হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার প্রিয় ঝর্ণার কাছে এসে দাঁড়ালো। ঝর্ণার জলেই তার আর্সী। সেই আর্সীতে বারবার নিজের চেহারা দেখে আর মনে পড়ে যাদের সে দেখেছে, তাদেরও ঠিক তারই মতন চেহারা। কে তারা? কোথা থেকে এলো? কোথায় বা চলে গেল?

বিশেষ করে, তার নির্ব্বাক মনে বারে বারে ছায়া এসে পড়ে, সেই শিকারী দলের মধ্যে একটি বিচিত্র মূর্ত্তির···সে মূর্ত্তি হলো নারী-মূর্ত্তি···শিকারী-দলের নেতা মিঃ রিচার্ডের কুমারী মেয়ে নোরা !

প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে টারজানের মনে জেগে ওঠে আদিম কামনা। তার মানুষের দেহের ভেতরে ছিল মানুষেরি মন, যদিও সে মন ছিল ঘুমিয়ে। মানুষের মেয়ের প্রথম দর্শনে আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার পুরুষের মন। কিন্তু সে ব্যাকুলতার কোন অর্থই সে বুঝতে পারে না। কি যে করবে, তা ঠিক করে উঠতে পারে না। একবার হাতীর পিঠে চড়ে বসে, আবার তক্ষুণি গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে চলে, আবার ঝর্ণার কাছে এসে ঝর্ণার জলে নিজের ছায়ার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যার ছায়া পড়ে আসতে, সে আপনার মনে গাছের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলে, যেখানে সে দেখেছিল সেই মানুষদের। সেই জায়গাটা যেন তাকে টানতে থাকে !

(২)

মিঃ রিচার্ড এবং তাঁর সঙ্গে যারা ছিল, তারাও বনের ভেতর হঠাৎ সেই ধরণের মানুষের আকৃতি-ওয়ালা একটা পশুকে দেখে কম বিস্মিত হয় নি। বিশেষ করে নোরা।

টারজানের সেই নিরাবরণ বলিষ্ঠ শুভ্র কান্তি দূর থেকে দেখে নোরার প্রথম ধারণা হয়, গল্পে আর রূপকথায় সে যে বনদেবতাদের কথা পড়েছে, নিশ্চয়ই ঐ অদ্ভুত জীবটি সেই বনদেবতাদেরই একজন। আনন্দে আর বিস্ময়ে নোরা চীৎকার করে উঠেছিল। মিঃ রিচার্ড ভাল করে দেখবার আগেই বনের ভেতর সেই অদ্ভুত জীবটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁদের প্রত্যেকের মনেই প্রশ্ন জেগে ওঠে, আজ চোখের সামনে যে অদ্ভুত জীবটিকে প্রত্যক্ষ দেখলাম, সে কি ও কে ?

এই প্রশ্নের জবাব দিলেন সঙ্গের মিশনারী ডাক্তার উইলিয়াম্‌স্‌। উইলিয়াম্‌স্‌ বল্লেন, আমি এই অঞ্চলের অনেক বুনো লোকদের মুখে এবং কোন কোন মিশনারীর কাছে শুনেছি, এই বনের ভেতর টারজান নামে এক অদ্ভুত মানুষ শিশু থাকে। ছেলেবেলায় নাকি তাকে গেরিলারা চুরি করে নিয়ে যায়···খবরের কাগজে সে-খবরও বেরিয়েছিল, এক মিশনারী দম্পতীর শিশুকে গেরিলারা চুরি করে নিয়ে যায়। বোধহয় সেই মানব-শিশুই গেরিলাদের সঙ্গে থেকে গেরিলাদের মতন মানুষ হয়েছে।

অনেক লোক নাকি দূর থেকে দেখেছে, মানুষের মতন চেহারা একটা অদ্ভুত জীব গেরিলাদের মতন গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। উইলিয়াম্‌স্‌ বল্লেন, আমি নিঃসন্দেহ আমরা সেই পশু-মানব টারজানকেই দেখেছি।

নোরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তাঁদের কথাবার্ত্তা শোনে। আর মাঝে মাঝে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

—আচ্ছা, টারজান কি মানুষ, না পশু ?

উইলিয়াম্‌স্‌ জবাব দেন, আমি লোকদের মুখে যেসব গল্প শুনেছি, তাতে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর জীব নাকি আফ্রিকার জঙ্গলে নেই। গায়ে তার রাক্ষসের মতন শক্তি, গেরিলাদের চেয়ে জোরে সে এক গাছ থেকে আর গাছ বেয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, আর বনের হেন পশু নেই যে তাকে ভয় করে না !

নোরা কিন্তু বিশ্বাস করতে চায় না। সে বলে, আমার কিন্তু দেখে মনে হলো, অমন সুন্দর জীব পৃথিবীতে আর নেই।

মিঃ রিচার্ড নোরাকে সাবধান করে দিয়ে বল্লেন, এতখানি প্রশংসা ভাল নয় নোরা···তোমার জন্যেই আমার ভয়···তুমি যতদিন বনে থাকবে, একলা একলা কোথাও যাবে না !

এই ভাবে আলোচনা করতে করতে তাঁরা তাঁবুতে গিয়ে পোঁছলেন। সেখানে গিয়েও তাঁরা সেই অদ্ভুত জীবটির আলোচনা করতে লাগলেন। মিঃ রিচার্ড বল্লেন, আমাদের উচিত বন্দুক নিয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক হয়ে থাকা !

সেদিন রাত্রিতে ঠিক হলো একজন পালা করে বন্দুক নিয়ে জেগে থাকবে। সেই ব্যবস্থা মত সঙ্গের নিগ্রো চাকর মুসি প্রথম রাত বন্দুক হাতে জেগে বসে রইলো।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তাঁবুর সকলের নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে মুসিও নাক ডাকাতে আরম্ভ করে দিল।

(৩)

গভীর রাতে হঠাৎ নোরার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার মনে হলো কে যেন তাঁবুর কাছে ঝুপ্‌ করে গাছ থেকে পড়লো। সেই শব্দে নোরার ঘুমটা একটু পাতলা হয়ে গেল। তারপর তার মনে হলো, কে যেন তাঁবুর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ভয়ে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। উঠে বসে। দেখে—তাঁবুর একটা দিক ভীষণ নড়ছে। কে যেন বাইরে থেকে তাঁবু ঠেলে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয়ই বনের কোন জানোয়ার হবে মনে করে নোরা চীৎকার করে উঠলো, বাবা! বাবা! ওঠ!

মিঃ রিচার্ড বন্দুক পাশে নিয়েই শুয়েছিলেন। নোরার চীৎকারে ধড়মড় করে উঠে বন্দুক নিয়ে তিনি তাঁবুর পর্দ্দা ঠেলে বাইরে চেয়ে দেখতেই দেখেন, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সেই অদ্ভুত পশু-মানুষটিকে ...তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের বন্দুক গর্জ্জে উঠলো...

বন্দুকের আওয়াজে চার-দিকের তাঁবুশুদ্ধ লোক ছুটে বেরিয়ে এলো, নোরাও বেরিয়ে এলো।

মিঃ রিচার্ডের হাতের গুলি সোজা টারজানের পায়ে গিয়ে লাগে। সেই অবস্থায় টারজান লাফ দিয়ে একটা গাছের ডাল ধরে সামনের গাছের ওপর উঠে পড়ে। মিঃ রিচার্ড টারজানকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার যেই গুলি ছুঁড়তে যাবেন, অমনি নোরা ছুটে এসে তাঁর হাত চেপে ধরলো, দোহাই বাবা, গুলি করো না!

টারজান লাফ দিয়ে সামনের গাছের ওপর উঠে পড়ে।

নোরার বাধায় মিঃ রিচার্ড রাগে ক্ষেপে উঠলেন, তাঁর হাতের বন্দুক হাতেই

অনড় থেকে গেল। সেইটুকু অবসরের মধ্যে টারজান ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নোরার দিকে চেয়ে মিঃ রিচার্ড বলে উঠলেন, নোরা, এ তোমার ঘোরতর অন্যায়! একটা জানোয়ারের জন্যে তোমার ও-রকম করা মোটেই উচিত নয়!

নোরা সলজ্জভাবে বলে, বাবা, তুমি যাকে জানোয়ার বলছো, আমার মনে হয়, সে আমাদেরই মতন একজন মানুষ!

মিঃ রিচার্ড গর্জ্জে উঠলেন, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না··· কিন্তু তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, শিকারীর হাতে যখন বন্দুক থাকবে, তখন অমনি করে তার হাত ধরে টেনো না! যাও, শোওগে যাও!

সে-রাত্রিতে তাঁবুতে আর কারুরই ঘুম হলো না। সকালবেলা সকলে উঠে দেখে, বনের ঘাসের ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জমে আছে। সে-রক্ত মানুষের, না পশুর?

(৪)

সেদিন রাত্রিবেলায় ঘুরতে ঘুরতে টারজান হঠাৎ গাছের ওপর থেকে দূরে তাঁবুর আলো দেখতে পায়। তাঁবুর চারদিকে রাত্রিতে কাঠের আগুন জেলে রাখতে হয়, বনের পশুদের তাড়াবার জন্যে। টারজান সেই আলো লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসে। তার ধারণা হয়, যাদের সে দেখেছিল তারা নিশ্চয়ই সেই তাঁবুর ভেতর আছে। তাই রাত্রিতে তাঁবুর ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করে। কিন্তু মিঃ রিচার্ডের হাতের বন্দুক গর্জ্জে উঠতেই সে চমকে ওঠে। এরকম শব্দ এর আগে সে আর কোনদিন এত কাছাকাছি কখনো শোনে নি। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা বিদ্যুতের মত ছুটে এসে তার গায়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিকরে পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই তার মনে নিদারুণ একটা ভয় জেগে উঠলো। এরকম ভয় এর আগে আর কোনদিনই সে অনুভব করে নি। দেখলো, তার পা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। আর দেরী না করে সে লাফিয়ে একটা গাছের ডাল ধরে উঠে পড়লো এবং ঝুলতে ঝুলতে এক গাছ থেকে আর গাছে সে বনের ভেতর তার পরিচিত ঝর্ণার কাছে এসে উপস্থিত হলো। তার পায়ে যে গুলিটা লেগেছিল, তা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ ধরে অনর্গল রক্ত পড়ায় তার দেহ অবশ হয়ে কাঁপতে থাকে। সে চীৎকার করে ডাক দিয়ে উঠলো, কু—উ—উ···

নির্জ্জন অরণ্য তার সেই চীৎকারে কেঁপে উঠলো। সে আবার হেঁকে উঠলো, কু—উ···উ···ই···ই···

এবার বনের ভেতর থেকে যেন তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠলো···আঁউ··· উঁ···উঁ···

সঙ্গে সঙ্গে বনের ভেতর থেকে একটা তুমুল শব্দ জেগে উঠলো···যেন ঝড়ে গাছপালা পড়ে যাচ্ছে। সে-শব্দের মানে টারজানের কাছে জানা ছিল। দেখতে দেখতে দুজন গেরিলা সামনের গাছ থেকে ঝুপ্ করে এসে পড়লো আর সেই সঙ্গে টারজানের বন্ধু হাতী কুলোর মত কাণ দুটো লট্পট্ করতে করতে বিরাট দেহ নিয়ে ছুটতে ছুটতে টারজানের কাছে উপস্থিত হলো।

টারজানের পা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে দেখে, গেরিলা দুজন চীৎকার করে উঠলো, হুম্···হুম্···হুঁ···উঁ···

হাতীটা তখন শুঁড় দিয়ে জল তুলে টারজানের পা লক্ষ্য করে ছুঁড়তে থাকে। গেরিলাদের মধ্যে একজন ছুটে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একরাশ লতাপাতা এনে টারজানের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়। টারজান তক্ষুণি সেই লতাপাতা দুহাত দিয়ে চটকে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

হাতীটা শুঁড় দিয়ে টারজানকে পিঠে তুলে নিয়ে বনের ভেতর ছুটে পালাতে আরম্ভ করে। টারজানের কোন বাধা সে মানে না।

বনের ভেতর সবুজ-শেওলায় মোড়া একটা সুন্দর জায়গায় হাতী টারজানকে পিঠ থেকে নামিয়ে দেয়। সেই স্নিগ্ধ সবুজ শ্যাওলার বিছানার ওপর শুয়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে টারজান উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু যতবার উঠতে যায়, হাতী ততই শুঁড় দিয়ে ত কে ঠেলে ফেলে দেয়। পিছল শেওলার ওপর পায়ের ভর রাখতে না পেরে টারজান পড়ে পড়ে যায়। তার সর্ব্বাঙ্গ এইভাবে সেই শেওলার রসে ভরে ওঠে। দেখতে দেখতে তার দেহের সমস্ত দুর্ব্বলতা কেটে যায়, তার বদলে শরীরে নতুন করে দুরন্ত শক্তি জেগে ওঠে। সে জোর করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। এবার হাতী যেই শুঁড় দিয়ে তাকে ফেলে দিতে যাবে, টারজান তার শুঁড় ধরে একলাফে তার পিঠের ওপর চড়ে বসে। হাতী তখন ছুটতে আরম্ভ করে। ছুটতে ছুটতে একটা বিরাট হ্রদের ভেতর টারজানকে নিয়ে ঢুকে পড়ে। শুঁড় দিয়ে জল তুলে টারজানের গায়ে ছুঁড়ে মারে, এইভাবে জলের ভেতর দুজনে সুরু করে দুরন্ত খেলা।

সেই খেলায় টারজানের গায়ের সমস্ত শেওলার রস ধুয়ে যায়। কাঁচা সোনার মতন ফুটে ওঠে তার গায়ের রঙ।

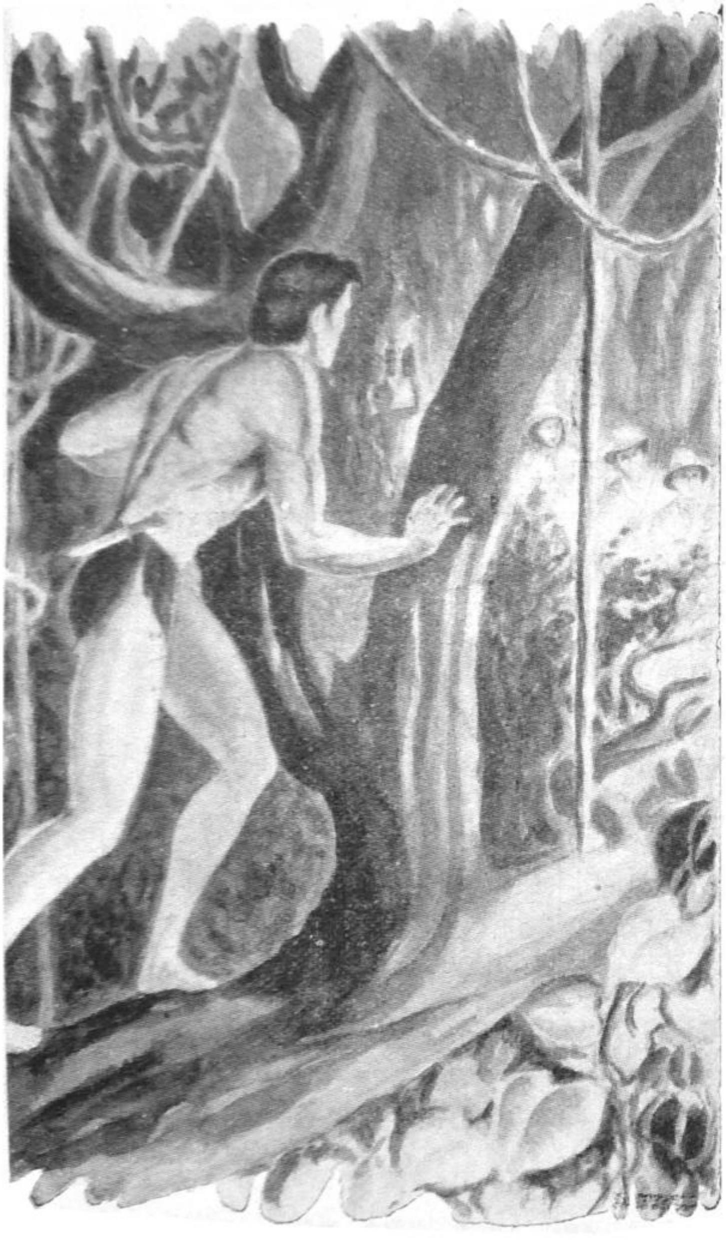

···দেখতে পেলো এক ঝাঁক কুমীর···

ইতিমধ্যে হ্রদের ধারে ধারে সমস্ত গাছের ওপর একটী দুটী করে গেরিলারা এসে জড় হয়। তারা জলে নামতে পারে না। গাছের ওপর থেকে তারা তাদের বিচিত্র আওয়াজে টারজানকে লক্ষ্য করে নানা রকমের কথা বলতে থাকে। টারজান বুঝতে পারে তাদের ভাষা। তারা জলে নেমে টারজানের সঙ্গে খেলতে পারছে না বলে, তাদের মনে জেগে ওঠে দুরন্ত হিংসা। টারজান বুঝতে পারে তার গেরিলা বন্ধুরা ক্রমশ তার ওপর চটে যাচ্ছে। সে তাদের রাগাবার জন্যে আরো বেশী করে জলে মাতন সুরু করে দেয়। এমন সময় গেরিলারা একসঙ্গে ভীষণভাবে চীৎকার করে উঠলো ···দু'একজন গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে হ্রদের বাঁ-দিকে চেয়ে এক বিচিত্র আওয়াজ করে উঠলো। সেই বিচিত্র আওয়াজের অর্থ বুঝতে টারজান বা হাতীর এতটুকু দেরী হলো না। তারা বুঝলো, গাছের ওপর থেকে গেরিলারা দেখেছে কুমীরের দল তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। টারজান হাতীর পিঠের ওপর

চড়ে বসতেই হাতী ভাসতে ভাসতে তাড়াতাড়ি ডাঙ্গায় উঠে এলো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই এক ঝাঁক কুমীর জলের ভেতর থেকে মুখের খানিকটা তুলে সতৃষ্ণ-নয়নে ডাঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দুটো বড় শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। টারজান একদৃষ্টিতে সেই কুমীরের দলের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয়, এই মুহূর্ত্তে যেন সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, জলের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে! গেরিলারা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে তাকে ঘিরে দাঁড়ায় এবং তাকে বনের ভেতর এক রকম জোর করে টেনে নিয়ে যায়। এই অদ্ভুত মানুষ-পশুটীর জন্যে তাদের মূক পশু-অন্তরে প্রকৃতির রহস্যময় ইঙ্গিতে জেগেছিল এক সুগভীর মমতা। মানুষ পারে তার মমতাকে কথায় রূপ দিতে, তারা তা পারে না, এই যা তফাৎ। নইলে স্নেহ, ভালবাসা, মমতা তাদের অন্তরেও আছে, যেমন আছে মানুষের অন্তরে। কত লোক দেখেছে, পাশ থেকে সঙ্গিনী মরে গেলে, এই মূক পশু-সঙ্গীর দুচোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তে। এক অপূর্ব্ব প্রাণ-সূত্রে সমস্ত জীব-জগৎ বাঁধা।

(৫)

আহত হয়ে ফিরে এলেও, টারজান কিন্তু মন থেকে সেই তাঁবুর কথাকে সরিয়ে ফেলতে পারে নি। তার সঙ্গীরা কেউ না জানলেও, সে মনে মনে জানতো, সে আবার সেই তাঁবুতে যাবে। সেখানে তার ধারণা সেই অদ্ভুত শাদা জীবটি থাকে। তোমাদের হয়ত মনে আছে যেদিন সে প্রথম নোরাকে দেখে, সেইদিন থেকে তার মানুষের অন্তরে সেই মানবীটির জন্যে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, তার জীবনে এমন সুন্দর জীব সে আর দেখেনি। কে সে? কেন বার বার তার কথাই তার মনে জেগে উঠছে? তখনি তার মনে হচ্ছে, সব ফেলে দিয়ে ছুটে তার কাছে চলে যায়, যেমন করে পারে তাকে ধরে তার কাছে নিয়ে আসে!

গভীর রাত্রি···অরণ্য জেগে উঠেছে। মানুষের পৃথিবীতে রাত্রি আসে, মানুষকে ঘুম পাড়াবার জন্যে: অরণ্যে রাত্রি আসে, পশুদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে। সারাদিন যতক্ষণ সূর্য্য আকাশে থাকে, ততক্ষণ অরণ্য প্রায় ঘুমিয়ে থাকে। তখন শুধু তৃণভুক ছোট ছোট প্রাণীরা আহারের খোঁজে ভয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রির ছায়া নামলেই তারা তাড়াতাড়ি যে-যার গর্ত্তের ভেতর ঢুকে পড়ে; কারণ, তারা জানে সেই কালো ছায়ায় জেগে উঠবে ভয়ঙ্কর সব পশুর দল। রাত্রির সেই নিশাচর অরণ্যবাসীদের চোখের আলো অন্ধকারে নীল আলোর মত জ্বলতে থাকে···চলে অরণ্যের নির্ম্মম

আত্মরক্ষা আর আক্রমণের চিরন্তন খেলা···যে যাকে পায়, যাকে পারে, তাকেই ধ্বংস করে। কোন দয়া নেই, মায়া নেই, ক্ষমা নেই।

সেই রাত্রির অন্ধকারে টারজানের গেরিলা বন্ধুরা যে-যার গাছের ওপর আশ্রয় নিয়েছে···এই রাত্রি তাদের কাছেও মহা-আতঙ্কের রাত্রি। দিনের আলোয় তারা অরণ্যের আতঙ্ক. কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তারা আবার খরগোসের মতন ভয়ে কাঁপে। তারা সিংহকে ভয় করে না, বাঘকে ভয় করে না। তারা ভয় করে, অন্ধকারে মিশে যারা আসে, দীর্ঘ লম্বা তাদের দেহ···নিঃশব্দে অন্ধকারে কখন তাদের জড়িয়ে ধরে, তা তারা জানতেও পারে না···অজগর সাপ। এবং এই সব অজগর সাপ একবার যদি পাক দিয়ে তাদের ধরতে পারে, তাহলে সেই পাকের মোচড়েই তাদের দম বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের ছোট্ট ফলের মতন আস্ত গিলে ফেলে। এইভাবে রাত্রির অন্ধকারে তাদের কত বাচ্ছা যে অজগরের পেটে চলে গিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই অজগরের ভয় থেকে টারজান তাদের বহুবার বাঁচিয়েছে। তাই টারজানকে তারা অরণ্যের সব চেয়ে শক্তিশালী পশুরূপে ভালবাসে, মানে, শ্রদ্ধা করে। টারজানই তাদের শিখিয়েছে, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন একজন জেগে পাহারা দেবে। পাতার ওপর দিয়ে বরফের মতন ঠাণ্ডা আর প্লেন দেহ নিয়ে যখন অজগরেরা এগিয়ে আসে, তখন বাতাসে অতি সামান্য একটা খস্‌খস্ আওয়াজ হয়, শুনতে শুনতে অরণ্যের অসংখ্য আওয়াজের মধ্যে টারজান অজগরের এই নিঃশব্দ আসার আওয়াজকে পর্য্যন্ত তফাৎ করতে পারে। অরণ্য হলো বাণীহীন শব্দের রাজ্য, সেখানে প্রত্যেক শব্দের আছে আলাদা একটা মানে, আলাদা একটা সঙ্কেত।

আজ সারারাত ধরে টারজান জেগে আছে। মাঝে মাঝে শব্দ হয় আর সে চমকে চমকে ওঠে। কিন্তু সব সময় তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে নোরার সেই শাদা-পোষাক-পরা অপরূপ মূর্ত্তি।

হঠাৎ গভীর রাতে চাঁদের আলো সারা বনে ছড়িয়ে পড়লো। সেই চাঁদের আলোয় টারজানের মনে হলো, দূরে, বনের ধারে, মাঠে নোরার মতন কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে! টারজান চমকে ওঠে। সে নিঃশব্দে গাছ থেকে গাছে ঝুরি ধরে ধরে চলতে আরম্ভ করে। যতই চলে, ততই তার সামনে সেই শাদা মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টারজান তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এক গাছ থেকে আর গাছে, কখনো লাফিয়ে, কখনো ঝুরি ধরে ছুটতে আরম্ভ করে।

আগামী বারে "টারজানের তৃতীয় এ্যাড্‌ভেঞ্চার"

সাগুর পাঁপড়

[কুমারী ইলা দাস]

উপকরণ ঃ—সাগু এক পোয়া, মরিচ গুঁড়ো, পোস্ত, তেল, গোটাজীরে ও লবণ আন্দাজ মত।

প্রণালী ঃ—প্রথমে সাগু ভিজিয়ে রাখুন। তারপর যেভাবে সাগু তৈরি করে সেইভাবে তৈরি করুন। এবার উনান হ'তে নামিয়ে আন্দাজ মত লবণ, পোস্ত, গোটাজীরে ও মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিন এবং একটু নেড়ে একটা বড় থালা বা বেশ ভাল সমান দেখে একটা কাটা টিনে তেল বুলিয়ে (তেল একটু বেশী দিলেই ভাল) একটা বড় চামচে দিয়ে সাগুটা ছোট ছোট লুচির আকারে সেই টিন বা থালার ওপর ঢেলে দিন। তারপর রোদ্দুরে রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিন। এবার গরম তেলে ভেজে খেয়ে দেখুন কেমন লাগে '

ছোলার ডালের হালুয়া

[কুমারী রেবা মিত্র]

উপকরণ ঃ—ছোলার ডাল আধ সের, চিনি আধ সের, দুধ এক সের, ঘি আধ পোয়া, তেজপাতা, বাদাম, পেস্তা, ছোট এলাচ ও কিস্‌মিস্ কিছু।

প্রণালা ঃ—হালুয়া তৈরির কয়েক ঘণ্টা আগে ডালগুলি ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ডালগুলি ভালভাবে ভিজলে বেশ মিহি ক'রে বেটে নিন। এবার দুধটি ঘন করে রাখুন। তারপর উনানে কড়া চড়িয়ে ঘি দিন, ঘি গরম হ'লে তেজপাতা কয়েকটি ও ডালবাটাটি দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ নাড়ার পর কিস্‌মিস্ ও পেস্তাগুলি দিয়ে দিন এবং নাড়তে থাকুন। ডালটির রং বেশ লাল্‌চে মত হ'লে ঘন দুধটি দিয়ে দিন এবং নাড়ুন। কিছুক্ষণ নাড়ার পর চিনি দিন, তারপর কয়েকবার নেড়ে উনান হ'তে নামিয়ে ছোট এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এবার খেয়ে দেখুন কেমন সুস্বাদু !

মাতৃ-দর্শন

— করবী দেবী

পরমারাধ্যা বিশ্বজননী
কল্যাণময়ী মাকে
পরমসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ
বিরাম বিহীন ডাকে।
পাগলের মত ফুকারে কেবল,
"ওগো মা দাওগো দেখা—
ভজন-পূজন বৃথা হোলো সব,
আর যে পারি না একা !
কোলে তুলে লও সন্তানে তব,
এ ঘোর অন্ধকারে—
মা জ্যোতির্ময়ী ভাসাও আমায়
আলোকের পারাবারে।
আর যে পারি না ওগো চিন্ময়ী
কেন তুমি চুপ আছ—
চিন্ময়ী-রূপে দেখাও আমায়
কত ভালোবাসিয়াছ !"
শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদে আর বলে,
বলে আর শুধু কাঁদে,
ধূলায় লুটায়, মায়ের চরণে
ফুল দেয় নানা ছাঁদে।
সহসা সেদিন একি হোলো শেষে
আঁধার পালালো দূরে,—
ও কার মূরতি দেখা দিল আজ
সারা পূজাঘর জুড়ে ?
পরমসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ
বিস্ময়ে দেখে চাহি,—
এসেছেন আজ জননী তাঁহার
আর কোনো ভয় নাহি !
সাধনার ফল পাওয়া গেল আজ—
পাওয়া গেল আজ মাকে,
জোড় হাতে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ
'মা-মা' বলে আজ ডাকে।

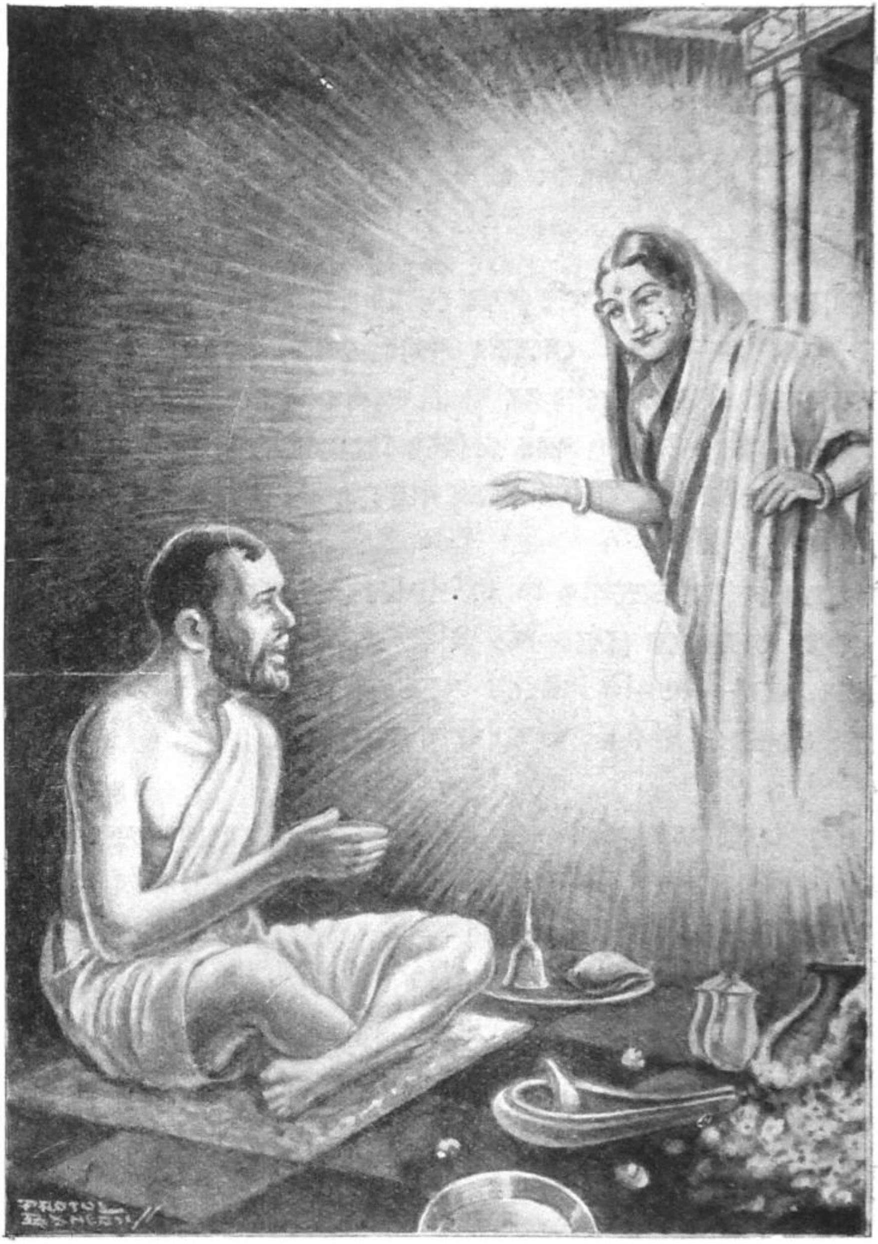

"পরমসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্ময়ে দেখে চাহি—　　[পৃঃ ৬২

—হরকরা

ইটালীতে সম্প্রতি একটি অতি অদ্ভুত মেয়ের খবর পাওয়া গেছে। এই মেয়েটির নাম হচ্ছে আনা মোনারো। মেয়েটির শরীর থেকে একরকম সবুজ আলো বের হচ্ছে সব সময়ে এই আলো বের হয় না ; কিন্তু যখন হয় তখন তিন, চার সেকেণ্ড্ থাকে। মেয়েটি যদি উপোস করে, তাহলে দিনে অনেকবার এই সবুজ আলো বের হতে থাকে। মেয়েটির কিন্তু কোনো অসুখ নাই।

বিলাতের কোনো ভদ্রলোক বি. এ..পাশ করবার পর হঠাৎ তার খেয়াল হোলো সে মেপে দেখবে তার বিদ্যে হয়েছে কত ইঞ্চি! তখন সে করলো কি—পুরো দুই মাস পরিশ্রম করে'—যতগুলি বই সে পড়েছিল তাদের লাইন মেপে দেখ্ল তার বিদ্যে হয়েছে ৬,৯৬,৯৬০ ইঞ্চি। অদ্ভুত খেয়াল যা হোক্!

ইংলণ্ডের একটি ২৮ বছরের মেয়ে হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। অবশেষে ডাক্তার তার পেট চিরে ১৮টা চাবি, ২টা মুদ্রা, ৩টা সেফ্টিপিন, ১টা বোতাম আর ১টা পেন্সিল-কাটা কল্ বের করেন। এগুলো বের করবার পর রোগিণী খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠে।

নাক যার বড় তাকে আমরা 'নাকু' বলে ঠাট্টা করি। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় নাকের অধিকারী ছিলেন মিঃ টমাস্ ওয়েডার্স নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক। তাঁর নাকটি ছিল ৭॥০ ইঞ্চি দীর্ঘ।

*

মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত মধুবাণী সাব-ডিভিশানে শামাউল নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি তেলী জাতীয় স্ত্রীলোকের অদ্ভুত একটি শিশু সন্তান

জন্মেছিল। এই শিশুটির দুটি মাথা, চারটি কাণ, চারটি চোখ ও চারটি হাত। শিশুটি জন্মাবার পর মাত্র ছয় ঘণ্টা বেঁচেছিল।

*　*　*　*　*

আমেরিকার কোনো এক আপিসের বড় সাহেব মিঃ জন্‌সন্—যখনই রেগে যান তখনই পেন্‌সিল চিবুতে আরম্ভ করেন। তাঁর রাগ হলেই তাঁর কর্মচারীরা তাঁর হাতে একটির পর একটি পেন্‌সিল গুঁজে দেয়। দশ-বারোটা পেন্‌সিল্ না চিবিয়ে তাঁর রাগ কমে না। রাগের সময় হাতের কাছে পেন্‌সিল্ না পেলে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দেন।

*　*　*　*

বিলাতের এক প্রফেসারের অদ্ভুত একটি ক্ষমতা ছিল। তিনি একদৃষ্টিতে এক একটা প্যারাগ্রাফ পড়তে পারতেন, আর এক সেকেণ্ডে ৭০টা শব্দ পড়তে পারতেন। একটা বড় উপন্যাস পড়তে তাঁর মাত্র ২৪ মিনিট সময় লাগ্‌ত।

নারকোল-ক্ষেতে যন্ত্রে চাষ

রোটারী-চাষ যন্ত্রে নারকোল-বাগানেও চাষ করা যায়। 'জেম্' নামে খুব ছোট একরকম রোটারী যন্ত্র নারকোল-চাষের উপযোগী। আমাদের দেশে এ সব জিনিষ আজও বুঝি এক মহা বিস্ময়!

অমর বাণী

"ধনে কি মানুষ বড়মানুষ হয়? ধনের বড়মানুষ কখনই মনের বড়মানুষ নহে। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমার আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমার সম্মান করিব না, বাহুবলের জন্য তোমার সম্ভ্রম করিব না, কেবল মন দেখিয়াই পূজা করিব। তুমি যদি স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া আমাকে দণ্ডদানে উদ্যত হও, তথাচ আমি দণ্ডভয়ে কদাচ তোমাকে

জন্ম :
১২১৮ সাল
২৫শে ফাল্গুন

মৃত্যু :
১২৬৫ সাল
১০ই মাঘ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
[মৃত্যুর পরে তোলা ফটো]

দণ্ডবৎ করিব না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্রচিত্তে সাধুস্বভাবে ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া আগমন কর, তবে তোমার দর্শনমাত্রই আমি ধূলি-ধূসরিতাঙ্গ হইয়া পদতলে প্রণত হইব। অতএব যদি মানুষ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল কর ও সরল হও, আপনি ছোট হইলেই বড় হইবে; আপনাকে বড় জানিলে কখনও বড় হইতে পারিবে না।"

(—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

অবাক্ হয়ে দেখো !

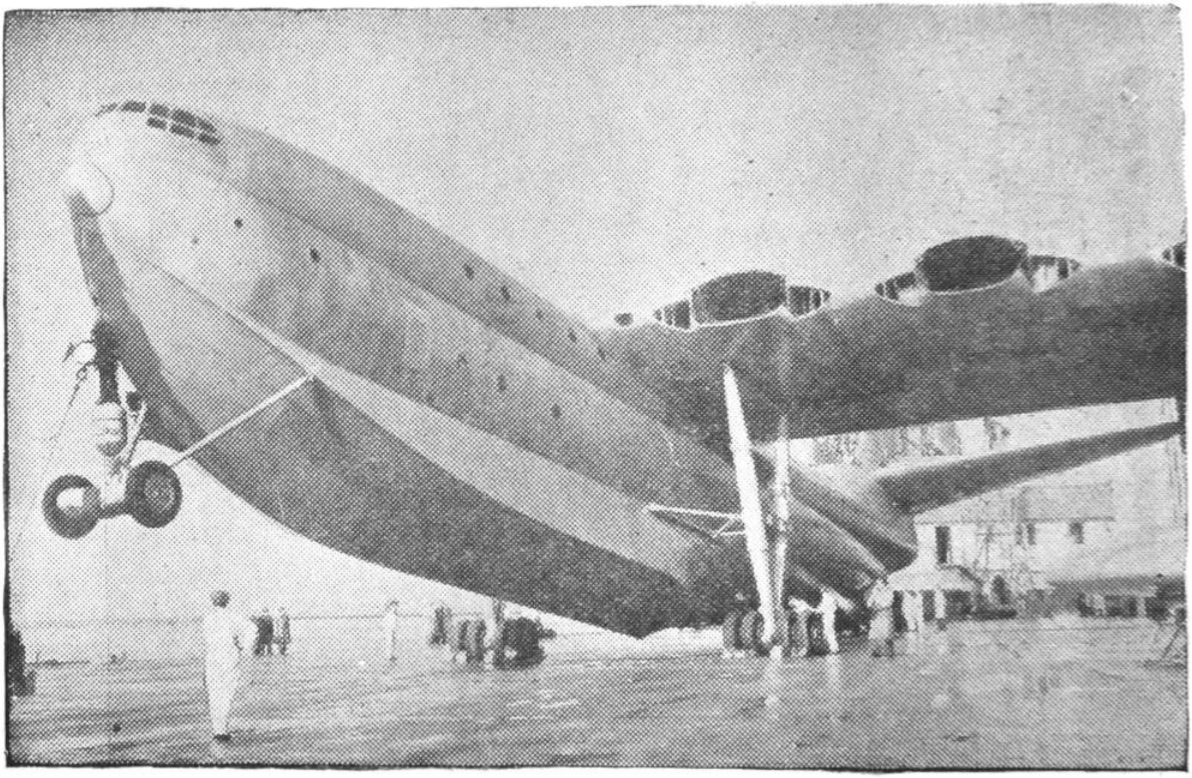

যাত্রিবাহী সবচেয়ে বড় বিমানপোত

ইংরেজ আজ ১৯৫২ সালে সর্ব্বপ্রথম দাবী করবার অধিকারী হয়েছে যে, যাত্রিবাহী সবচেয়ে বড় বিমানপোত একমাত্র তাদেরই আছে। এতে দু শ' যাত্রী দিব্যি আরামে বসে যাতায়াত করতে পারে।

"শোনো মা ভজার মজার কথাটি,—
রেলগাড়ি কভু চড়ে নি,—

আরো তাজ্জব ব'নে গেছি শুনে
"শুকতারা" কভু পড়ে নি !

ভোঁদার ভোজবাজী •• ছবি ও কথা •

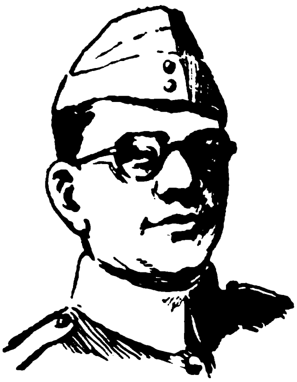

নেতাজী

—ছায়া ভট্টাচার্য
[গ্রাঃ নঃ ৯৯৩৭]

পরাধীনতার লৌহ-নিগড়ে যখন ভারতমাতা
বিদেশীর দাপে হতমর্যাদা, লাঞ্ছিতা, পদানতা,
প্রতিকার তার ছিল না তখন রিক্ত আপন-ঘরে,
নির্জীব জাতি মূক হয়ে ছিল উগ্রশাসন-ডরে।

তরুণ কিরণ-প্রভায় যেমন ধরার সুপ্তি ভাঙি'
দীপ্ত মহান্ রবির উদয় পূর্ব-আকাশ রাঙি',
সুপ্ত জাতিরে জাগাতে তেমন ভারত-ভূমির পরে
হয়েছিল তব উদয়, নেতাজী ! বিধাতার কোন্ বরে !

বিজাতি-শাসন করি' অবহেলা, বিপ্লবী মহাবীর !
করিলে সমর বিপক্ষে তার, লয়ে উন্নত শির ;
নূতন আশায়, নূতন সাহসে বাঁধিলে জাতির প্রাণ,
পরাধীন এই দেশের দুঃখ করিবারে অবসান।

স্পর্ধা তোমার হেরি' বিস্ময়ে জাতির শত্রুদল
তোমারে বন্দী করিতে প্রয়োগ করিল কত না ছল !
সমরে বিজয়ী হলো ইংরাজ, তবু হে ভারতবীর,
তুমি রয়ে গেলে অজেয় মহান্, করিলে না নতশির !

● পূর্ব্ব-ঘোষণা অনুসারে এ মাসে আমাদের প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ছিল "নেতাজী"—কবিতায় বা গদ্যে।

অনেক লেখাই আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের বিচারে শ্রীমতী ছায়া ভট্টাচার্য্যের লেখাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিম্নে তার লেখাটি উদ্ধৃত করা হলো। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার যথাসময়ে তাকে পাঠানো হবে।

—সম্পাদক, "শুকতারা"

জানে না তা কেহ, আরো সুকঠিন কোন্ সাধনার তরে
করেছিলে তব প্রাণমন দান, আমাদের অগোচরে !
ভাগ্য তোমারে লইয়াছে টানি' জানি না কোন্ সে পথে,
চেয়ে থাকি তবু, যদি আস ফিরে অজানা সুদূর হতে !

মুক্তির ধ্বজা শিরে লয়ে তুমি করেছিলে অভিযান,
কে বা তা জেনেছে, কেই বা ভেবেছে কতখানি তার দান !
নূতন আলোর আভায় আজিকে, ঘুচিল আঁধার-রাশি,
চির-শৃঙ্খল টুটেছে মাতার, ফুটেছে শ্রীমুখে হাসি ।

দিনান্তে ঐ গগনেসূর্য নামিছে অস্তাচলে,
মোদের জাতির সূর্য অমনই নিভেছে এ ধরাতলে ;
গগন-সূর্য ফেলি' যায় পিছে নিবিড় অন্ধকার,
মোদের সূর্য রাখিয়া গিয়াছে স্বাধীনতা-উপহার !

ধানক্ষেতে যন্ত্রে চাষ

ভিজে স্যাঁৎসেতে জমির পক্ষেও রোটারী-চাষ যন্ত্র উপযোগী। এশিয়া মহাদেশের কোন কোন অংশেও এম্‌নি যন্ত্রের সাহায্যে ধানক্ষেতে চাষ করা হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ ভারতে কোথাও এমন প্রচেষ্টা আজও হয়নি। আর তার ফলেই এদেশে এত অন্নাভাব।*

—শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ টেষ্টম্যাচ—ভারতীয় দলের শোচনীয় পরাজয়—এম সি সি দলের নিকট ভারতীয় দলের চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে, কানপুর গ্রীণ পার্কে শোচনীয় পরাজয় সম্বন্ধে রয়টারের বৈদেশিক ক্রিকেট সমালোচক মিঃ লেস্‌লি স্মিথ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি খুবই যুক্তিপূর্ণ। তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এই যে, "মাঠের পিচের উপর খেলা নির্ভর করে খুব বেশী। সকল সময়ে—পিচের অবস্থা সমান থাকে না। যে দল পিচের উপর আধিপত্য রক্ষা করিয়া খেলিতে সমর্থ হয়, সাফল্য তাহারাই লাভ করে। ইংলণ্ড দল এইরূপ পিচের সহিত যুদ্ধ করিতে অধিকতর অভিজ্ঞ, কানপুরের খেলা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। কানপুরে পিচের অবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় দলের দল গঠন সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার ছিল। নির্ব্বাচকমণ্ডলী এখানেও হয়ত ভুল করিয়াছেন। দলে দুইজন লেগ স্পিন বোলার গ্রহণ করার কোন সদ্‌যুক্তি নাই। কানপুরের পিচে স্লো এবং অফ্‌ স্পিন বোলারদের সুবিধা যতটা হইবে, লেগ্‌ স্পিন বোলারগণ তত সুবিধা করিতে পারিবেন না। কেননা মাঠ কঠিন না হইলে লেগ্‌ স্পিন বলের দ্বারা সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে। এই খেলাটিতে মোট বত্রিশটি উইকেট পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে ৩০টি উইকেট অফ্‌ স্পিন বোলারগণের সাফল্য।" বাস্তবিকই ভারতীয় দলের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দল গঠনের সিদ্ধান্তকে খুব যুক্তিপূর্ণ বলা যায় না। সি এস নাইডু ও সিন্ধেকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে বোধ হয় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখন ও পঞ্চম টেষ্ট বাকী রহিয়াছে। এই খেলাটি যদি ড্র হইয়া যায়, তাহা হইলেও এম সি সি, 'রাবার' লাভ করিবে। ইহা আমাদের কাহারো ইচ্ছা নয় যে, একটি মাত্র খেলায় জয়লাভ করিয়া ইংলণ্ড দল রাবার লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করিবে। সেই জন্যই আমরা আশা করি যে মাদ্রাজের পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দল জয় লাভ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে।

পঞ্চম টেষ্ট খেলার ভারতীয় দলের নির্ব্বাচন কণ্ট্রোল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেশ ভাল হইয়াছে। এবারে দলের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ডিভেচা ও গোপীনাথকে পুনরায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। মুস্তাক আলীকে দলে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভাল হইয়াছে

কিনা তৎসম্বন্ধে কিছুই মন্তব্য করা যায় না। মুস্তাক আলী কৃতি খেলোয়াড় ত বটেই, তবে বর্ত্তমানে তিনি কিরূপ সাফল্য লাভের উপযোগী পূর্ব্ব হইতে সঠিক ধারণা করা যায় না। পঞ্চম টেষ্টের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম পরে বলিতেছি।

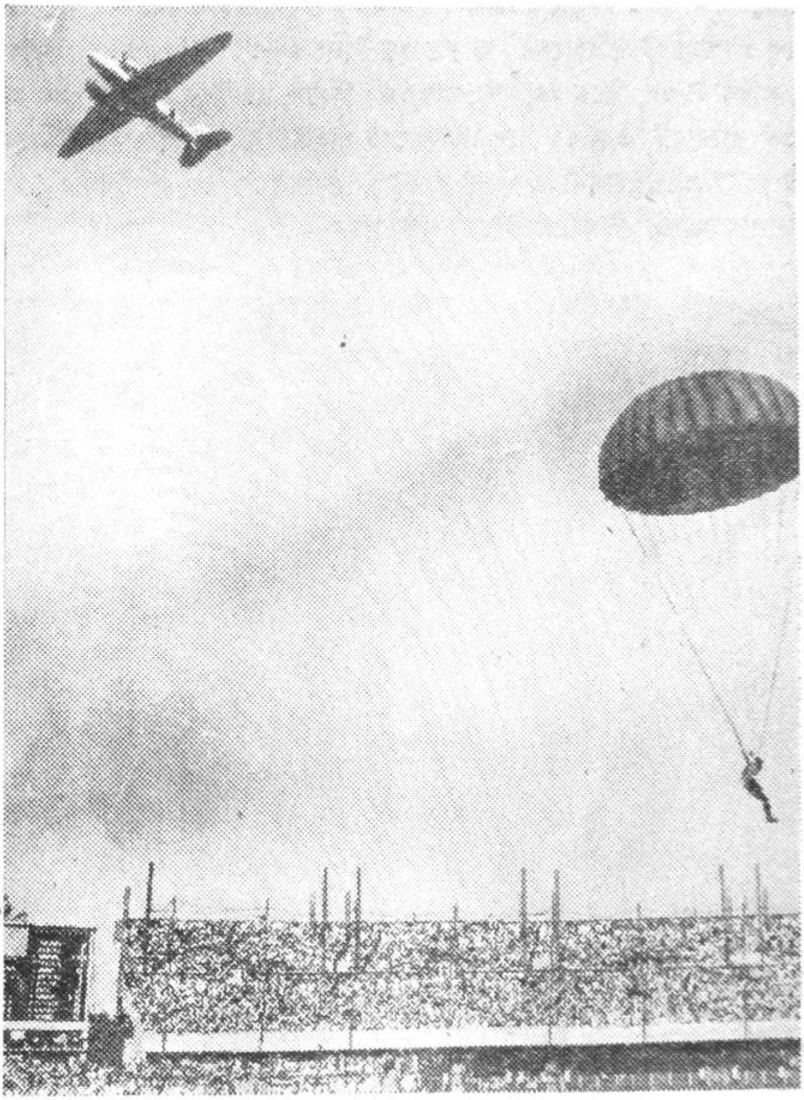

শূন্য হইতে খেলোয়াড়ের মাঠে অবতরণ—আই, এ, এফ্ হকি দল মোহন বাগানের বিপক্ষে এন, সি, সি মাঠে একটি প্রদর্শনী হকি ম্যাচ খেলেন। খেলাটির মধ্যে একটি বিশিষ্টতা ছিল। খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আই, এ, এফ্ দলের খেলোয়াড়গণ বিমান হইতে শূন্য পথে প্যারাশুটের সাহায্যে মাঠের মধ্যস্থলে অবতরণ করেন। ছবিতে দেখা যাইতেছে, দলের অধিনায়ক লেফ্‌টেনাণ্ট এ, চক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রথম উক্ত নূতন কৌশলে মাঠে খেলিতে নামিতেছেন।

চতুর্থ টেষ্টের ফলাফল—ভারত ১ম ইনিংস—১২১ রাণ। তন্মধ্যে পি, রায় ৩৭ রাণ, মানকড় ১৯ রাণ, সি, এস, নাইডু ২১ রাণ। হিল্টন ও ট্যাটারসল যথাক্রমে ৩২ রাণে ৪টি ও ৪৮ রাণে ৬টি উইকেট পাইয়াছেন। **ইংলণ্ড ১ম ইনিংস**—২০৩ রাণ। তন্মধ্যে ওয়াটকিন্স ৬৬ রাণ, লোসন ২৬ রাণ, স্পুনার ২১ রাণ, পুল ১৯ রাণ। মানকড় ও গোলাম আমেদ যথাক্রমে ৫৪ রাণে ৪টি এবং ৭০ রাণে ৫টি উইকেট পাইয়াছেন। **ভারত ২য় ইনিংস**—১৫৭ রাণ। তন্মধ্যে মোঞ্জরেকার ২০, উম্রিগড় ৩৬, অধিকারী ৬০, সিন্ধে ১৪, পি, রায় ১৪। হিল্টন, রবার্টসন ও ট্যাটারসল যথাক্রমে ৬০ রাণে ৫টি, ১৭ রাণে ২টি এবং ৭৭ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন। **ইংলণ্ড ২য় ইনিংস**—৭৬ রাণ (দুই উইকেট)। তন্মধ্যে গ্রেভনী ৪৮ (নট্ আউট্), লোসন ১২ এবং রবার্টসন ৫ (নট্ আউট্)। মানকড় ও গোলাম আমেদ ১টি করিয়া উইকেট পাইয়াছেন।

পাঁচ হাজার মিটার দৌড়—সিটি এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের একটি দৃশ্য। বি, এন, রেল দলের (খড়গপুর) পক্ষ হইতে সত্যনারায়ণ (সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিম স্থানীয়) পাঁচ হাজার মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতেছেন।

চারিটি টেষ্টের ফলাফল—প্রথম টেষ্টম্যাচ্ (দিল্লী) অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ্ (বোম্বাই) অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তৃতীয় টেষ্টম্যাচ্ (কলিকাতা) অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। চতুর্থ টেষ্টম্যাচ্ (কানপুর) ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

পঞ্চম টেষ্ট দল—(১) বিজয় হাজারে (ক্যাপ্টেন), (২) পি, সেন (উইকেট রক্ষক), (৩) মুস্তাক আলী, (৪) অমরনাথ, (৫) মানকড়, (৬) ফাদকার, (৭) ডিভেচা, (৮) পি, রায়, (৯) গোলাম

আমেদ, (১০) অধিকারী, (১১) গোপীনাথ। দ্বাদশ ব্যক্তি—উম্রিগড়। অতিরিক্ত—যোশী এবং সিন্ধে।

রন্‌জি ট্রফি—ফাইনালে বাংলা দল (পূর্ব্বাঞ্চল)—আসামকে এক ইনিংস ও ৪১৩ রাণে পরাজিত করিয়া বাংলা দল রনজি প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে উন্নীত হইয়াছে। আঞ্চলিক ফাইনালে বাংলা দলকে এইবার হোলকারের সহিত খেলিতে হইবে। বাংলা দলের বোলারগণের মধ্যে টেষ্ট খেলোয়াড় এন, চৌধুরী প্রথম ইনিংসে ও সি, এস, নাইডু দ্বিতীয় ইনিংসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উইকেট লাভ করিয়াছেন। আসামের ব্যাট্‌সম্যানগণের মধ্যে প্রথম ইনিংসে এ, গুহরায় ও দ্বিতীয় ইনিংসে হাজারিকার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে বাংলাদলের মধ্যে চারিজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করিবার কৃতিত্বলাভ করেন। বাংলাদলের মোট ৭৬০ রাণের মধ্যে পি, রায় ১৪৬, শিবাজী বসু ১৪৫, এ দাসগুপ্ত ১১৭, সি, এস, নাইডু ১১৯ রাণ করেন। আসামের প্রথম ইনিংসে মোট রাণ হয় ১৮০ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে (ফলো অন্) মোট রাণ হয় ১৬৭।

হোলকারের বিপক্ষে বাংলাদল—নিম্নলিখিত ১৫ জন খেলোয়াড় রন্‌জি ট্রফির পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে হোলকারের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন:—সি. এস. নাইডু (অধিনায়ক), এন. চ্যাটার্জ্জী, পি. সেন, এন. চৌধুরী, সুধাংশু ব্যানার্জ্জী, পঙ্কজ রায়, গিরিধারী, শিবাজী বসু, জি. রায়, পি. চ্যাটার্জ্জী, বি. ফ্র্যাঙ্ক, এ. দাশগুপ্ত, পি. বি. দত্ত, জে. মিত্র, এস. খান্না।

চৈত্র ও বৈশাখের প্রতিযোগিতা

আমাদের চৈত্র মাসের প্রতিযোগিতার বিষয় হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংদেব, আর বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার বিষয়—"রবীন্দ্রনাথ"।

"শুকতারার" গ্রাহক-গ্রাহিকদের মধ্যে যে কেউ এতে যোগদান করতে পারে। কবিতায় বা গদ্যে লিখতে হবে আর "শুকতারার" তিন পৃষ্ঠার চেয়ে বড় কোন লেখা গৃহীত হবে না।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব" সম্পর্কে রচনার লেখা চাই ১৪ই ফাল্গুনের মধ্যে আর "রবীন্দ্রনাথ" সম্পর্কে রচনা আমাদের হাতে আসা চাই ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে।

প্রত্যেক লেখার সঙ্গে লেখক বা লেখিকার গ্রাঃ-নম্বর ও তার বয়সের উল্লেখ প্রয়োজন। কাগজের দু পৃষ্ঠায় লেখা রচনা গ্রহণ করা হবে না।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্য বিজয়ী প্রতিযোগীকে "দেব সাহিত্য-কুটীরে"র প্রকাশিত ৩৲ টাকা মূল্যের যে কোন বই পুরস্কার দেওয়া হইবে (মাশুল স্বতন্ত্র)। সম্পাদক—**"শুকতারা"**।

নূতন ধাঁধা

১। হাড্ডির সমুখে যেই
রাখিনু চরণ,
দেখিলাম বস্তু এক
বিরাট গড়ন।

২। দুইটি রমণী যেই পাশাপাশি র'ন
একটি পুরুষরূপে প্রকাশিত হন।

৩। অতি পরিচিত নদী
কিছুবাদ দাও যদি—
অমনি আকাশতলে
ভেসে যাবে দলে দলে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। বালিন ২। বাদাম ৩। ৩, ৯, ২, ১৮

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

নিভু্ল

শ্রীতারাপদ আচার্য্য—শ্যামচক, মেদিনীপুর; সুভাষ, সুনীল, শ্যামল ও অন্যান্য—৯০১০; সত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল—ভাণ্ডারনালী জলপাইগুড়ি; সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়—৭৬০৭; বাদলচন্দ্র কর—দরং, আসাম; মথুরানাথ

পাল—৯০৮৯; নারায়ণচন্দ্র ঘোড়াই—ইটাবেড়িয়া, মেদিনীপুর; দেবকুমার ব্যানার্জ্জি—শিলদা, মেদিনীপুর; আজাদ-হিন্দ সেবা সংঘের সদস্যবৃন্দ—নিলাম বাজার, কাছাড়; কুমারী মণিকা চট্টোপাধ্যায়—৮৪০১; নীলাক্ষী সিংহ—কুসুণ্ডা, মানভূম; কুমারী ভারতী ও হেলেন ব্যানার্জ্জি—টিতু, আসাম; কুমারী নীলিমা ভট্টাচার্য্য—রাধাবল্লভ রোড, নৈহাটী; ত্রিদিব ও প্রদীপ ভট্টাচার্য্য—সিঙ্গি, বর্দ্ধমান; পীযুষ দেব—৯৬১১; ভাস্করদেব মুখোপাধ্যায়—৬৭৭৯; প্রতাপকুমার মল্লিক—রাঁচি; ভক্তি ও মুক্তি—৮৮৯৪; লক্ষ্মীপদ নন্দী—মেদিনীপুর; বাদলচন্দ্র দাস—মেদিনীপুর; নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়—৯৮৯৩; এস সামসুল হুদা, এস নুরুল হুদা, বিজয়কুমার অধিকারী ও অন্যান্য—পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ; ভবতোষকুমার বসু—৭১৫৯; কল্যাণ কুমার লাহিড়ী—কুলটি, বর্দ্ধমান; সমীর, সনৎ ও অশোক ঘোষাল—কটক, উড়িষ্যা; কুমারী হেলা ও প্রদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী—৯১৩১; সবিতা, শান্তি, বিনয় ও অন্যান্য—মধুপুর, মুর্শিদাবাদ; মলয়কান্ত গুপ্ত—৯৭৬৮; নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—হাওড়া; মহিলা সংস্কৃতি সংঘের সভ্যবৃন্দ—জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ; সত্যপ্রিয় ভট্টাচার্য্য—লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; যতীন্দ্রনাথ রায় ও তৃপ্তিরাণী দেবী—মাল, জলপাইগুড়ি; রামযশ অগ্রওয়ালা—পঞ্চকোট রাজ, মানভূম; চুণীলাল রায়, উষা ও সন্ধ্যা—কাতলামারা, ত্রিপুরা; মন্টু, পীতু ও নন্তু—শাঁখারী, বর্দ্ধমান; নীহার, লক্ষ্মী, রেখা ও বাচু—শাঁখারী, বর্দ্ধমান; কুমারী ছায়া দেবী—পাষণ্ডা; অমলেন্দু রায় ও নির্ম্মলেন্দু মিশ্র—খালিনা এম, ই, স্কুল, মেদিনীপুর; সরল ও সুনীল—কাটিহার; ঝুনু, মনু, প্রীতিপদ ও অন্তু—মহেশ্বরী একাডেমী, কাটিহার; বিশ্বনাথ কোদালী—শ্রীরামপুর, হুগলী; গৌরমোহন পাজা—জগন্নাথপুর,, হুগলী; শশাঙ্কশেখর গায়েন—৭৮০৮; কুমারী প্রমীলারাণী রায়—হালতু, ঢাকুরিয়া-৩১; সুশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য—হালতু, ঢাকুরিয়া-৩১; উমা ও দেবব্রত মজুমদার—কালচিনি, জলপাইগুড়ি; গীতি, নব ও নাজু—৭২৬৬; কমলেশ চাটার্জ্জি—৮৯১৭; শিবানী এন্দ, অনিন্দিতা পাল ও শ্রাবণী কর—ডিগবয়; তুষারকান্তি বর্ম্মা—সিঙ্গুর, হুগলী; সুনীলকুমার প্রামাণিক—নিকুঞ্জপুর, বাঁকুড়া; নানকু, শচীন, দীপক—এলাহাবাদ; ঝরণা বসু—৯৯১৬; কুমারী সাধনা ভট্টাচার্য্য—নৈহাটী; মধু, শশাঙ্ক, জিতেন ও হাবুল—ঘাটশীলা, সিংভূম; সমীরকুমার দাস—হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ; অমল, রবি ও বুড়ী—গোয়ালটুলি, হুগলী; সনৎকুমার গাঙ্গুলী—৭৮৩২; মৃণালকান্তি সামন্ত ও সুনীলকুমার সান্যাল—কৈকালা, হুগলী; মাণিক, মৃন্ময় ও মৃত্যুঞ্জয়—কৈকালা, হুগলী; চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী—এস, এন, রায় রোড, কলিকাতা; লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী—৭৪৯৭; প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়—ইণ্টালী, কলিকাতা; মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ও প্রলয়কুমার দাশগুপ্ত—রসা রোড, কলিকাতা-৩৩; অনুকূল, জগদা, প্রমদা সাহা—দুবচাচিয়া, বগুড়া; অজিতকুমার দত্ত ও সুভাষচন্দ্র নাগ—শিলদা, মেদিনীপুর; মৃণাল, দীপ্তি, ছন্দা ও কঙ্কন গুপ্ত—ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯; অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য—৭০৬৮; তাপসকুমার সেন—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর; সোমেন্দ্র বসু—৭২২৩; সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—দিসেরগড়, বর্দ্ধমান; শশাঙ্কশেখর ব্যানার্জ্জি—গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬; পল্টু, দুলু, নন্টু ও মুকুল—কয়থা, বীরভূম; মহাশিনা, মতি ও মাণিক—কয়থা, বীরভূম; গোপাল, দুলাল, দেবীদাস ও শিবু—সিঙ্গুর, হুগলী; ধীরাজ গুহ ঠাকুরতা—৮২৮৮; অমূল্যকুমার সিংহ—বড়বাজার, কলিকাতা-৭; তরুণকুমার মিত্র—আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা; হুটমুড়া প্রধান ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ—৬৮৩৮; সোমনাথ ভট্টাচার্য্য—মাণিকপুর, মেদিনীপুর; শম্ভুনাথ রায় ও বিমলকুমার গিরি—চিল্কীগড়, মেদিনীপুর; পার্ব্বতীশঙ্কর রায়, অরুণ কুমার দাস ও বীরেনকুমার গিরি—চিল্কীগড়, মেদিনীপুর; প্রাণগোপাল মাহাত—ঘাটশীলা, সিংভূম; শঙ্কর, সমীর, অজিত ও সনৎ—সেনটোলা, চাইবাসা; লাহাই সমিতির সভ্যবৃন্দ—সেনটোলা, চাইবাসা; মণিকা ঘোষ—৯৯১০; নিশীথ, মামু, বাদল, পল্টু ও দিলীপ—সেনটোলা, চাইবাসা; ভীমেশ্বরী উচ্চ শিক্ষায়তনের দশম শ্রেণীর ছাত্র—মেদিনীপুর; স্মৃতি ও বারিদবরণ—৮০৫৬; অশোককুমার দুবে—৯৬৪০; কুমারশংকর চৌধুরী—মোহনচক, মেদিনীপুর; শ্রীপতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর; শংকর, গৌর, কানাই, শম্ভু ও অন্যান্য—সবুজ-সংঘ, মণিনাথপুর; অশোককুমার রায়—বাঙ্গালঝি, নদীয়া; শুক্লা মুখার্জ্জি—৭৭৯৫; নকুলেশ্বর মজুমদার—গিরিডি; সুপ্রিয়কুমার সেন—গিরিডি; দীপেশ, দেবেশ ও দীনেশ—শাঁখারী, বর্দ্ধমান; প্রণবকুমার সরকার—৮৭২৮; নকুলচন্দ্র ঘোষ, পশুপতি নাথ ও অন্যান্য—সালতোড়া, মানভূম; অনিলকুমার পাল—৭৩২৩; নিমাই, বীথি ও

অলকা শেঠ—বরোদা মিত্র লেন, কলিকাতা-৪ ; প্রশান্তচন্দ্র রায়—মৈনম, রাজসাহী ; খুকুরাণী ও কল্যাণী—কলিকাতা-২ ; দেবী মজুমদার—৭৪১২ ; কুমারী রাণী, দুর্গা, মায়া ও সবিতা—সিঙ্গুর, হুগলী ; দীপঙ্কর ও তীর্থঙ্কর মুখোপাধ্যায়—৭৬৬৩ ; জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও জয়ন্তী ভট্টাচার্য্য—৯৮৩৭ ; আঙ্গুর, প্রভাস ও প্রকাশ মুখার্জ্জি—কনকচাস, মানভুম ; সারদা কিস্কু ও যতীন্দ্রনাথ মাঝি—মানবাজার, মানভুম ; কমল, ঝুনু, সুনীতি ও রুণু ব্যানার্জ্জি—কনকচাস, মানভুম ; মীনা—কয়থা, বীরভুম ; সঙ্গীতকুমার দত্ত—৮২৯৬ ; যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়—কুমারগ্রাম দুয়ার, জলপাইগুড়ি ; নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়—৬৭৩৮ ; চিত্রা, ছবি, প্রীতি ও অন্যান্য—শিকড়া বালিকা বিদ্যালয়, ২৪ পরগণা ; আব্দুররব সালার—৮৮৩৭ ; বিন্দুপ্রকাশ পাল—গান্ধীকৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর ; জানকী, উৎপল ও নীলোৎপল—৬৬৯৯ ; রবীন্দ্রনাথ সান্যাল—৯২৫০ ; প্রদীপকুমার মৈত্রেয়—৯২২৯ ; মাধবচন্দ্র কর মজুমদার—বাঁশবেড়িয়া, হুগলী ; দিপালী ও অমর মান্না—সিঙ্গুর, হুগলী ; গণপতি, কল্যাণী ও দীপ্তি—জামসেদপুর ; শঙ্কর, বাদল ও দিলীপ—সেনটোলা, চাইবাসা ; চুণিলাল পাত্র—আঠাঙ্গি, মেদিনীপুর ; বিশ্বনাথ দে—৬৮৯৯ ; মুক্তিনাথ ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য—৬৯৮৬ ; পূর্ণেন্দু ও ডালিম ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য—গুপ্তিপাড়া, হুগলী ; নিগুণা, অনাদি, নারাণ ও অন্যান্য—৭৯৫৩ ; ভেদ, নোদ, নেউল, হাবলা ও বাপু—সিঙ্গুর, হুগলী, বিমলেন্দু দাক্ষিত—দেনুড়, বর্দ্ধমান ; অর্পণা, শর্ম্মিষ্ঠা ও ভাস্কর—ডিসেরগড়, বর্দ্ধমান ; আশীষ ও নির্ম্মাল্য ঘোষ—৯১৪২ ; শম্ভু ও ঝণ্টু—বারসই ঘাট, পুর্ণিয়া ; শব্বির, সামছুল, ইয়াসীন ও অন্যান্য—কেশবপুর, বর্দ্ধমান ; শঙ্করচরণ গড়াই ও সুশান্ত সেন—বোলপুর, বীরভুম ; তড়িৎকুমার বসু—৬৯৬২ ; মনোরঞ্জন সরকার ও নিমাই সরকার—৭৮৮৪ ; বুলু, করুণা ও মনা—চাইবাসা, সিংভুম ; কুমারী ডলু ও মনু ঘোষাল—৮৬৬৫ ; অধীর বণিক—৮৬০৯ ; শিবপদ মান্না—হিলি, পশ্চিম দিনাজপুর ; সমীররঞ্জন সেন, বিমল ও তপন—বড়বিল, বিবিকুল ; শঙ্করচরণ গড়াই ও সুশান্ত সেন, বোলপুর, বীরভুম ; সুকুমার দত্ত—জয়পুর, বাঁকুড়া ; হিমাংশু মণ্ডল, রবীন, মলয় ও অন্যান্য—হাওড়া ; মধুসূদন ঘোষ ও মণীন্দ্রশঙ্কর ঘোষ—মহামায়া স্কুল, সিঙ্গুর ; আখতার হোসেন, আকবর আলী ও মকছেদ আলী—মহাদেবপুর, রাজসাহী ; রথীন্দ্র দত্ত—৮৮৮৯ ; শম্ভুনাথ সরকার—৭৮৪১ ; কুমার প্রেসের কর্ম্মচারীবৃন্দ—সিঙ্গুর, হুগলী ; মীনা সেনগুপ্ত—সিঙ্গুর, হুগলী ; জীবনচন্দ্র ঘোষ—জলপাইগুড়ি ; দীপক দত্ত, কৃষ্ণকান্ত ও ধ্রুব সেন—সেবায়তন, মেদিনীপুর ; শৈলেশ ও পীযূষ সান্যাল এবং শিবেশ চট্টোপাধ্যায়—মুঙ্গের ; সুধাংশুশেখর জানা—রুইনান, মেদিনীপুর ; মন্মথ নাথ রায়—উদং, হাওড়া ; রজতকান্তি মিত্র—৭৯৬৬ ; গুরুপদ দাস—লক্ষ্মীসাগর, বাঁকুড়া ; সুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ; বেণিয়াটোলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৫ ; রাধেশ্যাম রায় ও সর্ব্বাণীপ্রসাদ মুখার্জ্জি—ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ; শঙ্কর চৌধুরী ও গৌরকিশোর—মদনমোহনছরি, মেদিনীপুর ; তাজাম্মেল হোসেন—৭৯২৮ ; প্রণবকুমার পাল ও মোজাম্মেল হোসেন—দিনহাটা, কুচবিহার ; দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর, হুগলী ; তারাপদ, খোকন, গৌরী ও খুকু—এগ্রিকো, জামসেদপুর ; শোভা, কৃষ্ণা ও খোকন—চন্দননগর, হুগলী, বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়—৭০৭৬ ; নৃপতি ও ইন্দু সামন্ত—কাজলাগড়, মেদিনীপুর ; জগদীশচন্দ্র মাইতি—৭৪৮০ ; কিরণময় ঘোষ—চেলেংহাট, আসাম ; অনন্তকিঙ্কর ব্যাকরণতীর্থ পুরাণরত্ন—অমর্ষি, মেদিনীপুর ; কানু, বেণু, অণু ও রুণু—বলিয়ামারিপাড়া, ডিব্রুগড় ; হৃদয়চন্দ্র সাহা—গোলাঘাট, আসাম ; মৃত্যুঞ্জয়, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমর—পাঁচগ্রাম হিন্দু-ছাত্রাবাস, মুর্শিদাবাদ ; লক্ষ্মীনারায়ণ কর্ম্মকার—গোলাঘাট, আসাম ; রমাপদ রায়—বালিঘাই, মেদিনীপুর ; রামানন্দ, ভারতী ও ইন্দিরা—৮৯৬৯ ; হিমাংশু দেব—জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি ; রত্নশ্রী মুখার্জ্জি, জয়শ্রী মুখার্জ্জি ও শ্যামশ্রী মুখার্জ্জি—ডিগবয় ; আশীষ, তাপস ও শিখা পাল—ক্লাব রোড, ডিগবয়, আসাম ; ঊষা, হিরু, খুকু ও রমা—পূজার ফিল্ড, ডিগবয় ; মুলিয়া বাড়ী বেঙ্গলী প্রাইমারী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ—ডিগবয়, আসাম ; অমলদেব রায়, শিশির চৌধুরী ও কমনীয় দাস—ডিগবয়, আসাম ; প্রণব দত্ত—৯৫০৯ ; সাগর, সন্ধ্যা, চন্দন ও অঞ্জলি বসু—তেজপুর, আসাম ; স্বপনকুমার কুণ্ডু—শ্যামবাজার, কলিকাতা ; ধূর্জ্জটি চ্যাটার্জ্জি—৮২২৭ ; রথীন্দ্রনাথ বসু—৭৩৫৬ ; সত্যবান, মিহির, হাবু ও বাবলু—বিশিণ্ডা, বাঁকুড়া ; সৃষ্টিধর পাঠক—মহুদা, মানভুম ; প্রতিভা সরকার ও ছায়া সরকার—৯৭৫০ ; পাকু, থাকু ও বেলা—বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর ; মোজাম্মেল হক—রাজসাহী ; খেলেন্দ্র সিংহ—হক্তিয়ার খোলা, শ্রীহট্ট ; স্নিগ্ধেন্দুভূষণ সেন ও গৌতম সেন—

আজাদ নার্শারী, রাঁচি ; ষষ্ঠীদাস ভট্টাচার্য্য—সিন্দুরী, মানভূম ; দিলু ও তনু—ঝুমরি তিলাইয়া, হাজারিবাগ ; শরৎকুমার নায়েক—বোলপুর, বীরভূম ; তুষারকান্তি ঘোষ—১০১৭ ; সীমু, তপু ও মুকুল—গোলমারী, জামসেদপুর ; সতীশচন্দ্র বেরা, চক্রপাণি চক্রবর্ত্তী, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়—চাইপাঠ, মেদিনীপুর ; সুখেন, দীপ্তি, দেবী ও বাচ্চু—ঘাটশীলা, সিংভূম ; সুশান্ত দাস ও প্রণবেশচন্দ্র মুখার্জ্জি—চুঁচুড়া, হুগলী ; রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬৯০৮ ; প্রবোধচন্দ্র মাইতি ও নারায়ণচন্দ্র অধিকারী—কুলাপাড়া, মেদিনীপুর ; বেহুলা, প্রভাবতী ও গিরিবালা—কুলাপাড়া, মেদিনীপুর ; অচ্যুতকুমার ব্যানার্জ্জি—গেঁওখালি, মেদিনীপুর ; সুখরঞ্জন ও মনোরঞ্জন সরকার—গোলাঘাট, আসাম ; সন্তোষকুমার সরকার ও প্রদ্যোৎকুমার সরকার—গোলাঘাট, আসাম ; নবশ্রী সংঘের সভ্য-সভ্যাগণ—ঈশ্বরীগাছা, ২৪ পরগণা ; নিরঞ্জন, দ্যুপতি ও শনিরঞ্জন—ডিগবয়, আসাম ; অনু, রাণু ও সুনীল—যশোদা টকীজ, ডিগবয় ; অমলেন্দু ও ননীগোপাল দাস—বিজয় নগর কলোনী, ২৪ পরগণা ; সত্যনারায়ণ চৌধুরী—তাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ ; মৃণাল দাশগুপ্ত, কল্যাণশঙ্কর, ঝুনঝুন ও অশোক সেনগুপ্ত—টালিগঞ্জ, কলিকাতা ; জ্যোতিষচন্দ্র নাথ—বড়পেটা, আসাম ; বীথি বিশ্বাস, নীতি বিশ্বাস ও অশোকরঞ্জন—করোলবাগ, নিউ দিল্লী ; গোবিন্দচরণ সেন—খুরুট, হাওড়া ; মদনমোহন কুণ্ডু—কাঁটালি, হুগলী ; পীযুষকান্তি গুপ্ত—৭৭৯০ ; কিশলয়, স্বপ্না, সলিল ও কৃষ্ণা সেন—লেক টেরেস, কলিকাতা-২৯ ; আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬৯৪২ ; সলীল ও সুনীল গুপ্ত—উদয়পুর ; পার্থসারথি চৌধুরী—৬৮২০ ; মীনা সেন—ষ্টেশন কোয়ার্টার, সিঙ্গুর, হুগলী ; ডলি ও মন্দিরা—৭১১৫ ; রজতকান্তি চৌধুরী—৯৩৬৩ ; অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—ডিব্রুগড়, আসাম ; জয়া চৌধুরী ও মমতা ভট্টাচার্য্য—৭০৩১ ; বদনচন্দ্র বড়ুয়া—আগমনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ? ; সার্ব্বজনীন লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ—বাঙ্গালীপাড়া, পূর্ণিয়া ; উষা, অরুণ, উদয়, বীথি ও যুথী—ফুলবাড়ী, দরং ; অশোক বসু, বিমল দাস ও মলয়—ডিগবয়, আসাম ; প্রজিতকুমার, সুহাসকুমার ও অন্যান্য—ডিগবয়, আসাম ; দীনবন্ধু সাহা—হিলি, পশ্চিম দিনাজপুর ; সুনির্ম্মলচন্দ্র দে—৬৯৯২ ; অমলেন্দু, অর্দ্ধেন্দু ও সমলেন্দু গায়েন—পাঁতিহাল, হাওড়া ; শ্যামল, গোরা, অঞ্জু, মুকুল—পশ্চিম দিনাজপুর ; প্রদীপ সিংহ—বালিগঞ্জ, কলিকাতা ; দিলীপকুমার সিংহ—বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; স্বপ্না মুখোপাধ্যায়—৯৫৪৫ ; বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় ও হীরামোহন সরকার—কৃষ্ণপুর, কুচবিহার ; উদয়ন লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ—কুচবিহার ; পরেশচন্দ্র প্রামাণিক, গুণধর বেরা ও প্রাণকৃষ্ণ জানা— ? ; ঈশ্বরচন্দ্র বেরা—৭৯৪৪ ; সান্ত্বনা গুপ্তা—হীরাপুর, ধানবাদ ; দিলীপ ভট্টাচার্য্য ও সত্যনারায়ণ মুখার্জ্জি—ঝরিয়া, মানভূম ; রঞ্জন রায়চৌধুরী—৮৯১০ ; কৃষ্ণা গুপ্তা—৭২২৪ ; সত্যেন্দ্র ভূষণ রায়চৌধুরী ও যোগেন্দ্রনাথ ভুঞা—হিলি, পশ্চিম দিনাজপুর ; দেবীপ্রসাদ চৌধুরী—চুঁচুড়া, হুগলী ; মৌলবী নুরউদ্দীন—কবিরহাট, নোয়াখালী ; বিশ্বনাথ সামন্ত—উচ্চগ্রাম, বর্দ্ধমান ; অণিমা, গৌরী ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়—৭৭১১ ; বদরতলা বীণাপাণি ক্লাবের সভ্যবৃন্দ—কলিকাতা-১৮ ; অতুলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও অতুলকৃষ্ণ বেরা—রুইনান, মেদিনীপুর ; আলোক ঘোষ, মন্দিরা, মৃদুল ও হেনা—৯৮১৪ ; রামকৃষ্ণ দাস ও শিবকৃষ্ণ দাস—শুকদেবপুর, ২৪ পরগণা ; নিলীমা ঘোষ—আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; দীপক ও গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী—ডিব্রুগড়, আসাম ; যোগমায়া মণ্ডল ও স্বপ্না দেবী—মাজু, হাওড়া ; কল্যাণী, খোকন ও পাইলট—ঝালদা, মানভূম ; বিমলকান্তি বসু—মজিলপুর, ঘোষপাড়া ; অজিতকুমার ব্যানার্জ্জি—৭১০৬ ; বুতুন, মাধব, গোবু, শেফালী ও অঞ্জলী—মোহনলাল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৪ ; সহদেব বারিক—আর, জি, বি, সি, ইনষ্টিটিউসন, ? ; ঝর্ণা, ও শিশির—ইছাপুর মাঝের পাড়া, ২৪ পরগণা ; সুকমল ও সুধাংশু—সিঙ্গুর, হুগলী ; অরুণ, দীপক ও দেবপদ—ডিগবয়, আসাম ; শুকদেব, বুদ্ধদেব ও বাসুদেব দত্ত—৯৭৩৮ ; লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ—দশঘরা, হুগলী ; ইলা, ছেণ্টু, নাণ্টু ও মণ্টু—৭৫৬৮ ; বৈদ্যনাথ মাহাত—পুঞ্চ, মানভূম ; রাহাম্দা জয়গোপাল বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ—বালিকভি, মানভূম ; অসিতকুমার দাস—৭৬২৯ ; অশোককুমার ঘোষ—কলিকাতা-৬ ; বলেন্দ্রনাথ নন্দী—৮৯৬০ ; সত্যনারায়ণ হালদার—দশঘরা, হুগলী ; আরতি, মীনাক্ষী, শান্তি, সুমিতা ও বুলু—৭১৭০ ; রঞ্জিত কুমার মুখার্জ্জি—৮৯৯৩ ; নীলাভ মুখার্জ্জি—৮২৬৩ ; আশিসকুমার দে—দুমকা, এস্ পি ; ধূর্জ্জটি ও ধ্রুবজ্যোতি রায়—৯৫৩৪ ; দীপক, হীরক, অনিতা ও বিনীতা—কয়থা, বীরভূম ; বীরেন পাল, সুজন (রেণু), পিটুার ও অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ—কয়থা পরিবর্দ্ধিত এম. ই. স্কুল, বীরভূম ; সত্যেন্দ্রনাথ দাস—পরাণপুর, মালদহ ; শোভা ও

অরুণ বাগ্‌চি—৭৯০১ ; যুথিকা ও অশোক সেন—৬৯১১ ; সুশান্তকুমার হালদার—৯৭৬৯ ; অজয়, অঞ্জলী, বন্দনা, জ্যোতি, জয়ন্তী ও শুভেন্দু চক্রবর্ত্তী—মজঃফরপুর ; আকুলচন্দ্র শর্ম্মা—৬৭৮৭ ; পূরবী ও অমিতাভ দে—জামসেদপুর ; উমাপদ মান্না—ভিমারীহাট, মেদিনীপুর ; আভারাণী সরকার, হাবুল, ডাবুল ও পুটুস—পার গোপাল নগর, হুগলী ; শ্যামল চক্রবর্ত্তী—বিহারী প্রামাণিক লেন, খুরুট, হাওড়া ; বেলিয়াঘাটা ব্রীজ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ—২৪ পরগণা ; রবি—৬৯০৮ ; নারায়ণ, নীহার ও নব কর্ম্মকার—পার্শলা, বাঁকুড়া ; অমরেন্দ্র, তারাপদ ও গোপাল—লক্ষ্মীসাগর, বাঁকুড়া ; হারাধন মণ্ডল—নারাণপুর, বাঁকুড়া ; প্রভাত মাইতি—৯৬৫২ ; কাশীডি উচ্চ বিদ্যালয়ের কমনরুমের সেক্রেটারী—মানবাজার, মানভূম ; রেবা রায়—দেশবন্ধু নগর ; সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত মাশ্চটক—কলিকাতা-২৮ ; চিত্তরঞ্জন বসু—পূজার ফিল্ড, ডিগবয়, আসাম ; তপন, সমীর ও শীলা ভট্টাচার্য্য—রিফাইনারী পাড়া, ডিগবয় ; মুকুল, দুলাল ও বাসু ভট্টাচার্য্য—রিফাইনারী পাড়া, ডিগবয় ; রেবেকা, সিপ্রা ও তিমির রায়—ডিগবয় ; কুমকুম, সন্ধ্যা ও দুলাল চক্রবর্ত্তী—ডিব্রুগড়, আসাম ; উমা, বাবুল ও অজয় চক্রবর্ত্তী—ডিব্রুগড়, আসাম ; দীপেন্দ্র বিশ্বাস—৮৭৫৯ ; বাসব বড়ুয়া ও মিহির চৌধুরী—কলেজ হস্টেল, কুচবিহার ; সুবোধ ও গোবিন্দ পাঁজাল এবং শ্যামাপদ হালদার—বজবজ ; দ্বিজেন্দ্র ও মনোজ ভরদ্বাজ এবং বনমালী দাস—শিলচর, আসাম ; দিলীপ, মিহির, জীবেন ও শংকর দত্ত—অম্বিকা পট্টি, শিলচর ; শিশির গুপ্ত—৬৮০৭ ; দিলীপ চক্রবর্ত্তী—৮২৫৩ ; বিমল, শৈলজা ও নির্ম্মল—চুঁচুড়া ; পুষ্প ও মনোতোষ গুপ্ত—আগরতলা, ত্রিপুরা ; সন্তোষরঞ্জন গুপ্ত—৯২২১ ; বাদল, ভোলা ও অনু প্রভৃতি—দুমকা, বিহার ; শৈলজা ও নীলা মুখোপাধ্যায়—বাবুগঞ্জ, হুগলী ; রণেন্দ্র, প্রতিভা ও অমিয় নিয়োগী—জামসেদপুর ; হরেন্দ্র খাঁ—৭৩৬২ ; তুলসী লাহিড়ী ও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য—নবদ্বীপ ; প্রহ্লাদ, ঝাটু ও রেণ্টু—কৈলাশহর, ত্রিপুরা ; মানস দেবর্ম্মন—৭৯৪৫ ; আইয়ুব রহমান ও হারু—বাজার-বনকাপাসী, বর্দ্ধমান ; স্মৃতি ও দীপ্তি চক্রবর্ত্তী—৯৮৩৫ ; অমর রায়, কানু ও সবিতা প্রভৃতি—হিরাপুর, ধানবাদ ; নির্ম্মল ঘোষাল ও দেবেন্দ্র শেঠ—এলেন গঞ্জ, এলাহাবাদ ; সুখেন্দু বক্সী—৮৩৫৩ ; নন্ত, মঞ্জু ও মিনু প্রভৃতি—খাসকেন্দ কলিয়ারী ; রমা, উমা ও শ্যামল দত্ত—বড়বাজার, মুঙ্গের ; কাজল দাশগুপ্ত—খলিয়ামারী, ডিব্রুগড় ; শম্ভু মোদক—ঝালদা, মানভূম ; তারক ও বাসন্তী সরকার—পুরুলিয়া ; বিনোদ দাশ—ভকত গাঁও, আসাম ; রবীন্দ্র বসু—বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন, হাওড়া ; চিত্রলেখা চৌধুরী—৯৮২৯ ; শেফালি ও শক্তিমনু ইত্যাদি—মধ্যপাড়া, ডিগবয় ; জ্যোতি ও মীনা সেন—শান্তিপাড়া, আসাম ; ধরমচাঁদ—হিলি, পশ্চিম দিনাজপুর ; রুস্তমকুমার—শান্তিপাড়া, ডিগবয় ; বাণু ও ননী—আধারাম লাইন, ডিগবয় ; বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ—ডিগবয় ; দীপক চক্রবর্ত্তী—ডিব্রুগড় বঙ্গীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ; বিলুন, ছবি ও বুলু আচার্য্যি—খলিয়ামারী, ডিব্রুগড় ; নীলু, অজিত কুনু ও তৃপ্তি—চাইবাসা, সিংভূম ; সুনীতি ও অনিল ব্রহ্ম—পুলিস লাইন, ডিব্রুগড় ; দিলীপ রায়—৭০১৮ ; রাণু, পিণ্টু, পনু প্রভৃতি—তিনসুকিয়া, আসাম ; মনোমোহন পাল—৬৯১২ ; সুকুমার ও গীতারাণী দাস—ভারতী ষ্টোর্স, নওগাঁও, আসাম ; খগেন দাস—নদিয়াড়া, মানভূম ; বিকাশজ্যোতি কর্ম্মকার—৭৫৫২ ; শ্যামাপদ ভৌমিক ও সন্দ্বিরঞ্জন ঘোষাল—নাড়াজোল মহেন্দ্র একাডেমী ; হিমাংশু ও ছায়াদেবী—৮১০০ ; অসীমা ও বুডডু—করিমগঞ্জ ; পৃথ্বীশ, প্রফুল্ল প্রভৃতি—৯ম শ্রেণী, বরাবাজার হাই স্কুল, বরাভূম ; রেখু ও বাবুয়া—বিষ্টুপুর, জামসেদপুর ; শ্যামল, অমল, কমল ও নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়—পশু চিকিৎসালয়, মুঙ্গের ; বুলবুল সরকার—পুরুলিয়া ; পশুপতি ও সুধীর—৮৭৯৫ ; বিশ্বনাথ সামন্ত—পারাজ, বর্দ্ধমান ; সজল, কাজল ও মঞ্জু—৮৩৭৬ ; শেখর কর—৯৮৮০ ; শান্তিময়, খাঁদু ও কালো প্রভৃতি—কদমা, জামসেদপুর ; জ্যোতির্ম্ময় ও পিণ্টু প্রভৃতি—থাইজল, লুসাই পাহাড় ; পান্নালাল চক্রবর্ত্তী—৯৯০৩ !

নিজস্ব ঘরোয়া চিঠি—

'জয় হিন্দ'! 'শুকতারা'র গ্রাহক-গ্রাহিকা-গণ! ঘন আঁধার রাতের অবসানে যখন প্রভাতের আলো ফুটে ওঠে, সারা জগৎ তখন তাকে কলকণ্ঠে অভিনন্দন জানায়! মনে হয়, গাঢ়তম পুরাতন আঁধার রাতের পর আলোকের পদক্ষেপ যেন এক আশাময় নতুনের সূচনা!

নতুনের মাদকতা, নতুনের আকর্ষণ, সারা জগতের শিশু-মনে কোন্ আবহমানকাল থেকেই যুগে যুগে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলে এসেছে! পৃথিবীর বুকে তারা নিজেরাই যে নতুন অতিথি! নতুনের জন্য তাই বুঝি প্রাণে তাদের জেগে ওঠে এক অব্যক্ত উন্মাদনা! তাই বুঝি প্রভাতের নতুন আলো, নতুন সূর্য্য, নতুন পাখী, নতুন ফুল বা দিনশেষে প্রথম-দেখা নতুন তারা ও নতুন চাঁদটির জন্য মন তাদের উতলা হয়ে ওঠে! আর ঠিক্ সেই একই কারণে "শুকতারা"র নতুন বছরের নতুন সংখ্যাটির জন্যও তোমরা কতই না অধীর আগ্রহে দিন গুণছিলে!

"শুকতারা"র আজই সর্ব্বপ্রথম পঞ্চম বছরে অভিযান সুরু হলো—পঞ্চম বছরে আজই তার প্রথম পদক্ষেপ। সারাটি বছর তার সুমুখে পড়ে আছে—সারাটি বছরই সে তোমাদের বুকের মণিকোঠায় আলো জুগিয়ে যাবে, এই তার কামনা। তা যদি সে পারে, তাহলেই মনে করবো "শুকতারা"র জীবন-পথ নিষ্কলুষ ও অমলিন, আর তা বেঁচেও থাকবে চিরকাল পূর্ণ গৌরবে! "শুকতারা" জানে—শুধু "শুকতারা" কেন, আজ জগৎ জানে—অসম্পূর্ণ বা নোংরামিকে কখনো পূর্ণতা বা পবিত্রতার ছদ্ম আবরণে কখনো চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না। তাই আজ দিকে দিকে ইতিহাসের পাতায় এত অঘটন-বিপর্য্যয়, এত ওলট-পালটের মাতামাতি! কোরিয়ার রণাঙ্গন ও মিশরের খাল তাই আজ নতুন ইতিহাস রচনায় এগিয়ে এসেছে। ভারতেও গণ-নির্ব্বাচনে তাই আজ অঘটনই ঘটতে সুরু করলো!

কংগ্রেসের পুণ্য দেউল আজ অশুচি-কলঙ্কিত পীঠস্থান! শুধু মন্দিরের অধিকারী দেবতার দোহাই দিয়ে বা কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ-নিনাদের কোলাহলে তার মর্য্যাদা আর অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হলো কই? পুরাতনের জীর্ণ ধ্বজা তাই আজ নতুনের আকর্ষণে পড়ি-পড়ি করে কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলো বটে, কিন্তু তাকে আজ পাশাপাশি দাঁড়াতে হলো ঠিক তাদেরই সঙ্গে যাদের সে এতদিন কেবল ঘৃণা ও অবহেলার চোখেই দেখে এসেছে!—ভারতের রাষ্ট্র শাসনে আজ আর কংগ্রেসের একাধিপত্য রইলো না। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দই আজ ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধার।

আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলে বা নতুন আদর্শ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব হলে—এমনি ভবিষ্যৎ চোখের

সুমুখে গড়ে ওঠে। "শুকতারা" তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে, ও তাই সে সতর্ক পদক্ষেপে আরো বেশী আন্তরিকতার সঙ্গে এগোতে চায়। কিন্তু সেজন্য চাই তার অন্তরতম প্রিয় সুহৃদ্ ও দরদী ভাই-বোনের দল। কাজেই তোমাদের পেছনে ফেলে সে এগোতে চায় না। আর তা যে সম্ভবও নয় বন্ধুগন ! কারণ, "শুকতারা" যেমন তোমাদের আদর্শ, "শুকতারাও" তেম্‌নি তোমাদের মত জীবন-চঞ্চল, উৎসাহ-সমৃদ্ধ তরুণ ভাই-বোন্‌দেরই তার আদর্শ করে নিয়েছে—অতীতে যেমন ভাবে এই শতধা-বিভক্ত ভারতের বিপুলায়তন সমাজই একদিন অতি-নগণ্য ও অতি-সাধারণ এক ব্যক্তিকে তার আদর্শ করে নিয়েছিল। গদাধর চাটুজ্যে তাঁর নাম।

যে যুগে ভারতের বুকে শুধু অর্থ ও ভোগের লালসাই চরম হয়ে উঠেছিল, লুটপাট ও আত্ম-সাতের মাধ্যমে যখন লর্ড ডালহৌসী ও লর্ড ক্যানিংএর রাজনীতি ভারতকে চরম আঘাত হানতে ব্যস্ত, আর ধর্ম্মের নামে এখানে সেখানে কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসার দাবানল জ্বলে উঠছিল, তেমনি সময়ে ঐ অতি-নগণ্য অশিক্ষিতপ্রায় গদাধর সগর্ব্বে ঘোষণা করেছিলেন—

"টাকা থাকলেই বড়-মানুষ হয় না, টাকার অহঙ্কার করতে নাই।...মনের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালো। কারণ, ঘরে যদি আলো না জ্বলে, তাহলে সে হবে দারিদ্র্যের চিহ্ন।......

পাপের পথে যারা অভিযাত্রী, সেদিন তাদেরও তিনি সাবধান করে বলেছিলেন,—

"পারা লুকিয়ে খেলেও তা হজম করা যায় না, একদিন তা গায়ে ফুটে বেরোবেই, লুকিয়ে পাপ করলেও তেমনি তা হজম হবে না, একদিন তার ফল ভোগ করতে হবেই।"

এ ছাড়া আরো যে প্রেমের ফল্গু ধারা তাঁর বুক থেকে বয়ে এসেছিল, তার ফলে পৃথিবীর বুকে জেগে উঠলো এক নতুন আদর্শ, আর পৃথিবী তাঁকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে অভিনন্দন জানিয়ে ছোটবড় ধনি-দরিদ্র সকলের মনোমন্দিরে তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিল !

"শুকতারা"র জন্মমাস ফাল্গুন মাস তাঁরও জন্মমাস। ফাল্গুনে আবির্ভূত হয়ে তিনি অর্থ ও ভোগ-লালসা পরিত্যাগের ঐশ্বর্য্যে ও তাঁর সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়ের দ্বারা জগতে এক আদর্শ সৃষ্টি করে গেছেন। ফাল্গুনে জন্মগ্রহণ করে "শুকতারা"ও তেম্‌নি এক আদর্শ সৃষ্টি করে যেতে চায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে সাহায্য করেছেন তাঁর উপাস্য দেবী—কালিকা দেবী, আর এই "শুকতারা"কে সাহায্য করবে তোমরা,—তার ভাই-বোনের দল।

"শুকতারা" তার এই নতুন জীবনে, তাই আজ চায় তোমাদেরই সহযোগিতা ও তোমাদেরই পরামর্শ।

প্রিন্সেপ-ঘাটে মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা—

বিগত ২৬শে জানুয়ারী শনিবার তারিখে প্রজাতন্ত্র-দিবসের উৎসব-আনন্দের মধ্যে কলকাতা প্রিন্সেপ-ঘাটে এক মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। ভারতীয় রণতরী 'দিল্লী' দেখার আগ্রহে অগণিত নর-নারী ও শিশু সেখানে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু প্রায় হাজারখানেক লোকের চাপে হঠাৎ জেটীর একখানি 'গ্যাং-ওয়ে' বা সেতু ভেঙে যায় ও ঝুপ্‌ঝুপ্ করে সকলে গঙ্গাবক্ষে পড়তে সুরু করে দেয়।

বেলা প্রায় তিনটার সময় এই শোচনীয় ঘটনাটি ঘটে। তারপর সন্ধানী-ডুবুরীরা সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত জলে-ডোবা হতভাগ্যদের অনুসন্ধান করতে থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ আট-দশটি মাত্র মৃতদেহের উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কত লোকের যে সলিল-সমাধি হয়ে গেলো, তার নিখুঁত হিসাব বোধহয় কোন দিনই সম্ভব হবে না।

উৎসব-মুখর প্রজাতন্ত্রী-দিবসেই এমন একটা শোচনীয় দুর্ঘটনায় সকলেই মর্ম্মাহত ও অভিভূত কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধান করলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাবে যে, এর মূলে রয়েছে দর্শনপ্রার্থী জনতার অশোভন আগ্রহ ও ব্যস্ততা। শৃঙ্খলারক্ষা বা ধৈর্য্যের অভাবে, সকলেই যদি ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে আগে যেতে চায়, তাহলে এক দিন তাদের পিছিয়ে যেতে হবেই। হয়েছেও তাই। তা ছাড়া, পুলিশ বা কর্ত্তৃপক্ষ যাঁরা সেখানে জনতা নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতাই এতে ফুটে উঠেছে।

এই 'দিল্লী' জাহাজ কয়েক বছর আগেও একবার এখানে এসেছিল 'নরফোক্' ব্রিটিশ জাহাজের সঙ্গে। সেবার জনতা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন 'নরফোকে'র কর্ত্তৃপক্ষ। সেবার কিছুমাত্র ত্রুটী কারো চোখে পড়েনি, আর এবার দেশীয় পরিচালনের ফলেই কি হলো এমন সর্ব্বনাশ? আমাদের মনে হয় এই সম্পর্কে আরো একটা জিনিষের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জেটীটি তৈরী হয়েছিল কবে, মাঝে মাঝে তার অবস্থার কোন তদারক করা হত কিনা, জীর্ণ-সংস্কারের কোন প্রয়োজন ছিল কিনা—এসব বিষয়ও দেখা দরকার। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, অনুসন্ধান করলে সম্ভবতঃ এদিক্ দিয়েও অনেক কিছু গলদ আবিষ্কৃত হবে। যাহোক্, দুর্ঘটনার ফলে যাঁরা আত্মীয়হারা হলেন, আমরা তাঁদের শোকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

মন্দ ছেলেদের ছোট্ট সহর—

এদেশে সমাজ-জীবনে আছে দুটো মাত্র বিভাগ—ধনী ও গরীব। কিন্তু এ হলো শুধু আর্থিক বিভাগ। তেম্‌নি আমাদের সমাজে আরো একটা বিভাগ আছে। সে হলো—ভালো আর মন্দ। এই দুরকম বিভাগের মধ্যে লক্ষ্য করবার হচ্ছে এইটুকু, গরীব যে, সে হয়তো কালক্রমে কোন দিন ধনী হতে পারে, কিন্তু মন্দ যে, সে কোন দিনই ভালো হয়ে চল্‌তে পারে না।

এর কারণ, আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। দুর্দ্দান্ত দুষ্টু ও বদ্‌মায়েস ছেলেদের এদেশে শাসনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাদের মানুষ করবার বন্দোবস্ত হয় কদাচিৎ। সম্প্রতি ব্রাদার ভিন্‌সেণ্ট নামে এক ইংরেজ সিঙ্গাপুরে এর এক ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন।

সিঙ্গাপুর সহরের প্রায় দু'মাইল উত্তরে এক বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে, তিনি তার ওপরে এক ছোট্ট সহর গড়ে তুলেছেন। সাত থেকে সতেরো বছরের সত্তরটি ছেলে নিয়ে তাঁর এই উদ্যম। তিনি তাদের সেখানে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে দিয়েছেন, দিয়েছেন তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা। "এটা করো না", "ওটা করো না", এম্‌নি সব বাধা-নিষেধ সেখানে নেই,—শাস্তি নেই।

সেখানে এক-একজনকে এক-একটি কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। সেখানে কেউ হয়েছে তাদের মেয়র, কেউ তদারক করে ফুল-বাগান, ফল-বাগান ইত্যাদি, আর কেউ বা তদারক করে তাদের নিজেদেরই কারখানা।

ব্রাদার ভিনসেণ্ট্ তাদের বিশ্বাস করেন, কাজেই চোখ না-রাঙিয়ে ও কোনরকম শাসন না-করে, তাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, ঐ ক্ষুদ্র

সহরটির যত কিছু দায়িত্ব। এর ফলে, ঐ "বদ্মায়েস্ মন্দ" ছেলেদের মধ্যেই গজিয়ে উঠেছে আত্মবিশ্বাস এবং নিজেদের দায়িত্ব তারা স্বেচ্ছায় সুন্দরভাবেই প্রতিপালন করে যায়।

আমাদের মনে হয়, মন্দ ছেলেদের যদি সুকৌশলে চালিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে এম্নি ফল সর্ব্বত্রই সম্ভব। ভারতে থাকলে চালুগুণা তিলককে হয়তো আজও কোন Reformatory

চালু-গুণা-তিলক—সিঙ্গাপুর অপরাধপ্রবণ দুর্দ্দান্ত ছেলেদের তৈরী ক্ষুদ্র সহরের মেয়র।

চালু-গুণা-তিলক নামে সতেরো বছরের এক দুর্দ্দান্ত বালক এখন সে সহরের মেয়র। ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি শিখতে তার এখন মস্ত আগ্রহ। সব-কিছু শিখবার নেশায় সে এখন মেতে উঠেছে, আর বিলেতে পড়তে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও এখন তার বুকের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

Schoolএ (চরিত্র-সংশোধক স্কুল) কার্য্যতঃ বন্দীভাবেই বাস করতে হতো!

এসব জিনিষ ভাববার মত লোক আজও কি এদেশে কেউ জন্মান নি?

নিমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকার—

পরম আনন্দের সঙ্গে আমরা ঘোষণা করছি যে, এ বছর শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর পূজা-উৎসবে আমরা যে সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছি, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) শ্রীরামপুর বঙ্কিম-স্মৃতি পাঠাগার—চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী। (২) প্রভাতী সঙ্ঘ,—সুবলচন্দ্র লেন, কলিকাতা। (৩) আদর্শবাদী তরুণ সঙ্ঘ—কোতুলপুর দক্ষিণপাড়া, বাঁকুড়া। (৪) সাসপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়—সাসপুর, বাঁকুড়া। (৫) নবপ্রভাত সমিতি—বোল্লা, কর্ম্মকারপাড়া। (৬) প্রদীপ-সঙ্ঘ—আরামবাগ, হুগলী। (৭) সিটি ক্লাব সভ্যবৃন্দ—২২, কুচা চৌধুরী, দিল্লী। (৮) কাশীডি প্রস্তাবিত চুনীরাম উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যাপীঠ। (৯) নেতাজী তরুণ-সঙ্ঘ ও নেতাজী পাঠাগার—জামালচক, শিবরামনগর। (১০) অগ্রণী সঙ্ঘ—নলহাটী, বীরভূম। (১১) মডার্ণ স্পোর্টিং ক্লাব—পার্কসার্কাস কেন্দ্র, কলিকাতা। (১২) তরুণ শক্তি-সঙ্ঘ পাঠাগার—৭৪ নং কাঁসারীপাড়া রোড, কলিকাতা। (১৩) বাংলার কথা লিমিটেড—১২এ, র'মানন্দ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (১৪) ভারতী পুস্তকালয়—বরাবাজার, পোঃ বরাভূম, মানভূম। (১৫) দাড়িয়াপাড়ার ছাত্র-ছাত্রীগণ—শ্রীহট্ট। (১৬) রঘুবীর ক্লাবের সভ্যবৃন্দ—বেগুণকোদর। (১৭) প্রবাসী সম্মিলনের সভ্যবৃন্দ—বিলাসীপাড়া। (১৮) মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় "আমাদের দল"—বহরমপুর, নেতাজী রোড, খাগড়া।

আমাদের উৎসাহী তরুণ ভাইবোনদের অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ আমরা সব সময় রক্ষা করতে পারিনা বটে, কিন্তু তা হলেও, তাদের আন্তরিকতা আমরা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করি ও সেজন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

নেতাজী জীবিত আছেন—

সম্প্রতি ২৩শে জানুয়ারী তারিখে কলকাতায় নেতাজীর জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। বছর বছর এমনি ভাবেই নেতাজীর মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ তাঁর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে আস্‌ছেন আর গভীর হতাশার মধ্যেও তাঁরা এই আশাই পোষণ করেছেন যে, উপযুক্ত সময়ে নেতাজী নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবেন! নিজেদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের জন্যও বুঝি এত গভীর আকাঙ্ক্ষা এত দীর্ঘকাল কখনো কাউকে মর্ম্মপীড়ায় অভিভূত করে রাখেনি! কাজেই তাঁর সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কত জনরবই না মুখর হয়ে উঠছে! গতমাসের "শুকতারায়"ই আমরা জানিয়েছি, এস্. এ. নায়ার নামে এক ভদ্রলোক নাকি ব্যক্তিগত ভাবেই জানেন যে, নেতাজী আর জীবিত নেই,—১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট ফরমোসায় বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত শীলভদ্র যাজী দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, নেতাজী আজও জীবিতই আছেন। এশিয়ার কোন অংশে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনও নাকি তাঁর ভক্তদের কেউ করেছিলেন! উপযুক্ত সময়ে নেতাজী তাঁর স্বদেশে আবির্ভূত হবেন, শ্রীযুক্ত যাজীও সে কথা বলেছেন।

তাঁর ঘোষণা অচিরেই সত্য হোক্ আমরা প্রার্থনা করি; আর প্রার্থনা করি, "শতং জীবতু নেতাজী!" "বন্দে মাতরম্!"

ভূতুড়ে গল্পের অপূর্ব্ব সঞ্চয়ন—

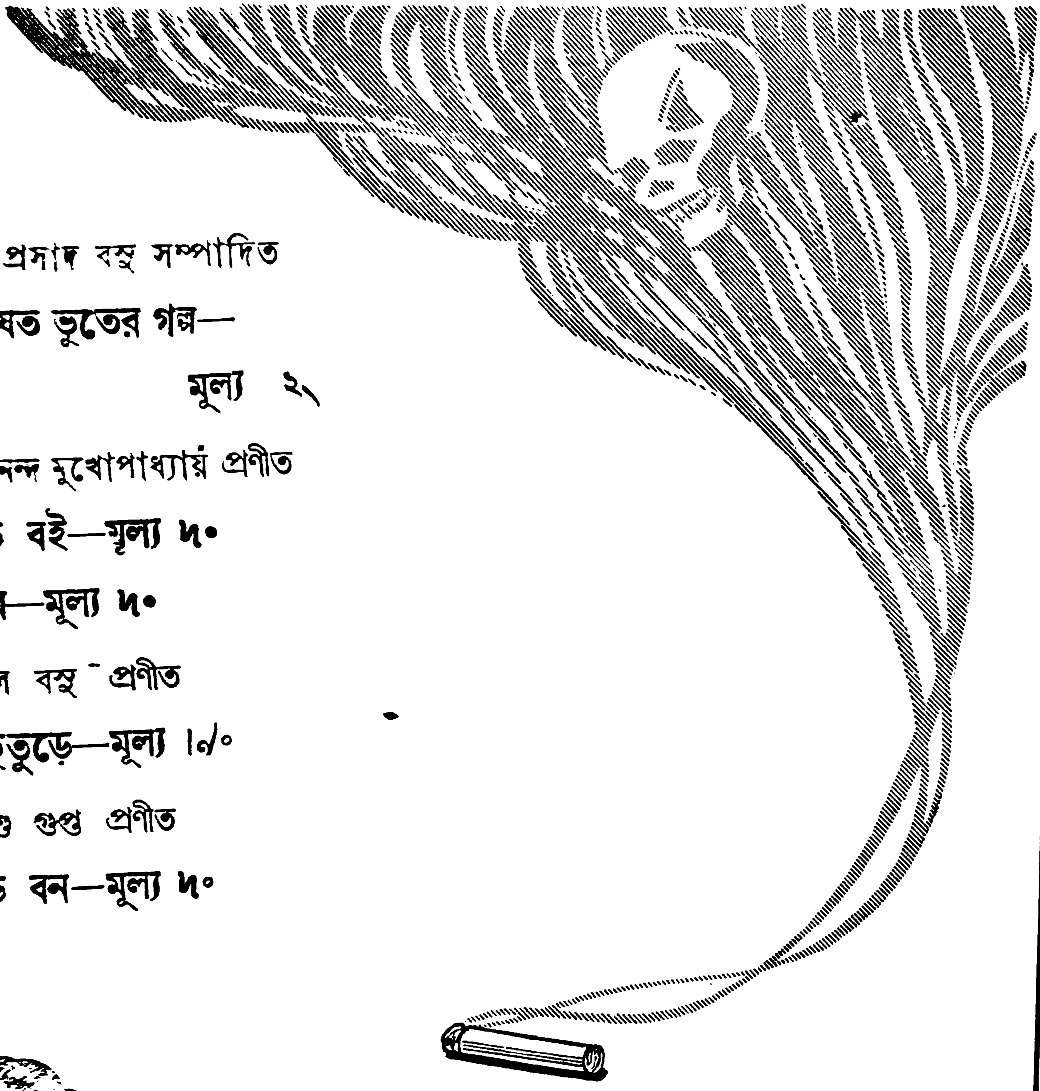

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

অদ্ভুত যত ভুতের গল্প—

মূল্য ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ভুতুড়ে বই—মূল্য ৸৹

অসম্ভব—মূল্য ৸৹

সুনির্ম্মল বসু প্রণীত

সব ভূতুড়ে—মূল্য ।৵৹

প্রভাংশু গুপ্ত প্রণীত

ভূতুড়ে বন—মূল্য ৸৹

য়্যাড্‌ভেঞ্চার ও ভয়াবহ কাহিনী-পরিপূর্ণ শিশু-উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

বিষের তীর—১৲ রক্তমুখী ড্রাগন—১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

আধুনিক রবিন হুড—১৲ আবার যখের ধন—১।৹

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন।

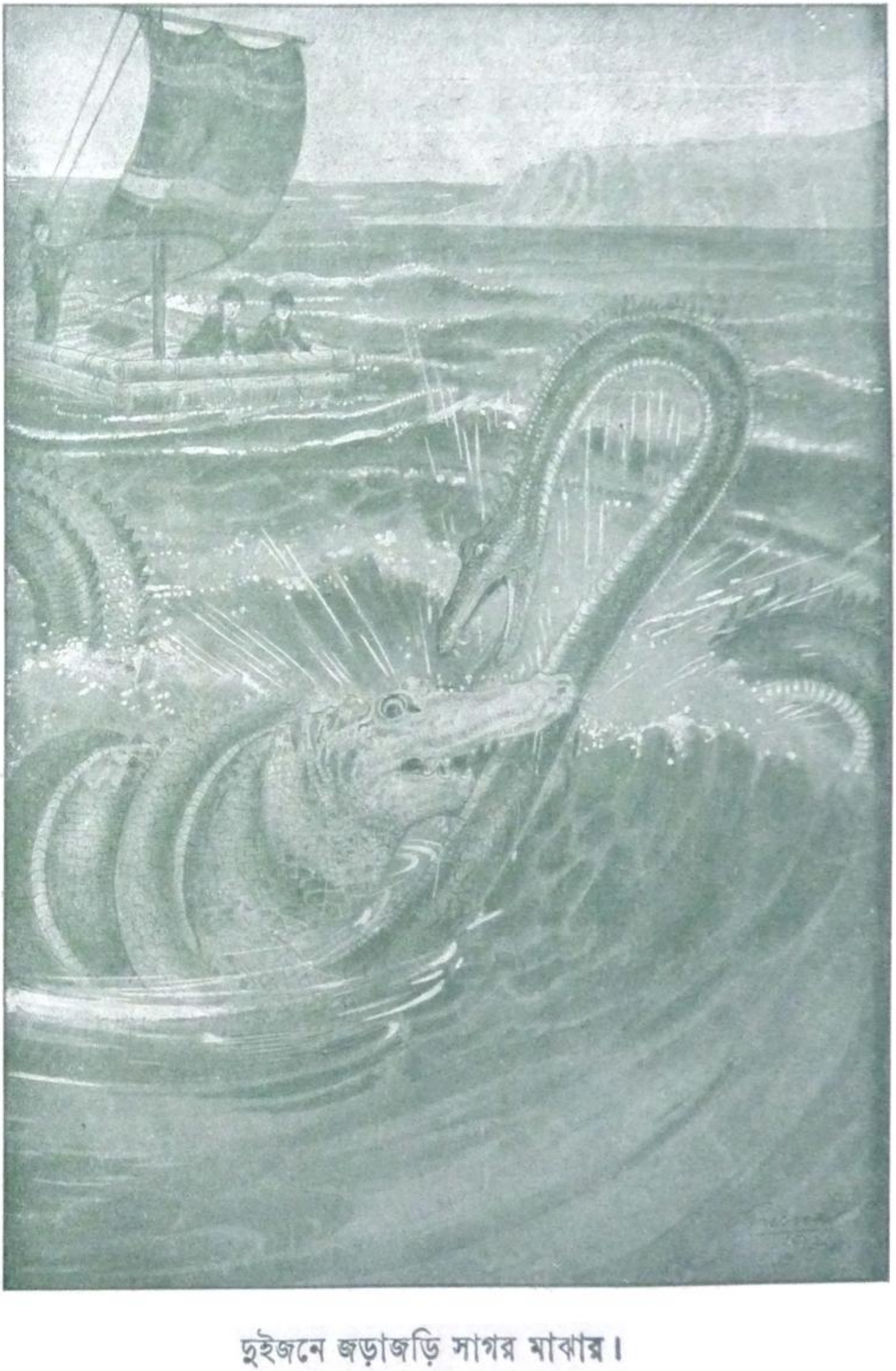

দুইজনে জড়াজড়ি সাগর মাঝার।